বৈশাখ ১৩৫৪

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

বিজ্ঞপ্তি

ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধাবলী ১৩২১ সালে ভারতীপত্রে প্রকাশিত হয়। এগুলি ইংরেজি[১] ও ফরাসী[২] ভাষায় অনূদিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু মূল বাংলা প্রবন্ধগুলি এ যাবৎ ভারতীর পৃষ্ঠাতেই নিবদ্ধ ছিল। চীন- ও ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা অবনীন্দ্রনাথই প্রথম করেন, এবং এই ক্ষেত্রে এই আলোচনাই এখনো অদ্বিতীয় হইয়া আছে।

অবনীন্দ্রনাথের এই ষড়ঙ্গব্যাখ্যান অনেক শিল্পশাস্ত্রী[৩] সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নাই। তৎসত্ত্বেও, এ বিষয়ে যাঁহারা চর্চা করিবেন শিল্পাচার্যের এই ব্যাখ্যান গভীর অভিনিবেশের সহিত তাঁহাদের আলোচনার যোগ্য, এবিষয়ে সংশয় নাই। অবনীন্দ্রনাথের মতামত যাঁহারা সবিস্তারে জানিতে চান তাঁহারা তাঁহার 'বাগীশ্বরী-শিল্প-প্রবন্ধাবলী' পড়িলে উপকৃত হইবেন।

---

১ *Sadanga or the Six Limbs of Painting.* The Indian Society of Oriental Art, Calcutta. 1921

২ *Sadanga, ou les six canons de la Peinture hindoue.* Editions Bossard, Paris. 1922.

৩ Ananda K. Coomaraswamy, *History of Indian and Indonesian Art* (1927), p. 88.

সূচী

পরিচয়

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্‌।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্‌॥

বাৎস্যায়ন-কামসূত্রের প্রথম অধিকরণ তৃতীয় অধ্যায়ের টীকায় যশোধর পণ্ডিত আলেখ্যের এই ছয় অঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন। যথা— প্রথম রূপভেদ, দ্বিতীয় প্রমাণ, তৃতীয় ভাব, চতুর্থ লাবণ্যযোজন, পঞ্চম সাদৃশ্য, ষষ্ঠ বর্ণিকাভঙ্গ।

কামসূত্রের রচনাকাল কাহারো মতে খৃস্টপূর্ব ৬৭১, কাহারো মতে বা খৃস্টপূর্ব ৩১২, আবার কাহারো মতে ২০০ খৃস্ট-অব্দ বই নয়। যশোধর পণ্ডিত কামসূত্রের টীকা রচনা করেন ১১ শত হইতে ১২ শত খৃস্ট-অব্দের মধ্যে।

যে-সকল প্রাচীন ও বৃহত্তর শাস্ত্রের সার সংকলন করিয়া বাৎস্যায়ন কামসূত্র রচনা করিয়াছিলেন সে-সকল শাস্ত্র এখন লুপ্ত। সুতরাং বাৎস্যায়নকথিত পূর্বশাস্ত্রসমূহে— যেমন বাভ্রব্যের সূত্রার্থ ও আগম ইত্যাদিতে— এই ষড়ঙ্গের প্রয়োগ কিরূপ বর্ণিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর পণ্ডিতও কোন্‌ প্রাচীন টীকা অবলম্বন করিয়া নিজের জয়মঙ্গল টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা উল্লেখ করেন নাই। কাজেই চিত্রে এই ষড়ঙ্গ যে কত প্রাচীনকাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল তাহা বলা কঠিন। তবে কামসূত্রে যখন চিত্রকলার উল্লেখ আছে তখন বাৎস্যায়নের পূর্ব হইতেই চিত্রবিদ্যার সহিত চিত্রের ষড়ঙ্গও যে এ দেশে প্রচলিত ছিল এটা সহজেই মনে হয়। অন্তত বাৎস্যায়ন যে সময়ে কামসূত্র রচনা করিতেছিলেন সে

সময়ে চিত্রের এই ষড়ঙ্গ যে জনসাধারণের নিকট সুবিদিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা কামসূত্রের উপসংহারে বাৎস্যায়ন স্পষ্টই বলিয়াছেন—

পূর্বশাস্ত্রাণি সংহৃত্য প্রয়োগানুপসৃত্য চ।
কামসূত্রমিদং যত্নাৎ সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্॥

অর্থাৎ, পূর্ব পূর্ব শাস্ত্রের সংগ্রহ ও শাস্ত্রোক্ত বিদ্যাদির প্রয়োগ অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ ঐ-সকল বিদ্যাদি কার্যত কি ভাবে লোকে প্রয়োগ করিতেছে তাহা দেখিয়া শুনিয়া যত্নপূর্বক সংক্ষেপে আমি এই কামসূত্র রচনা করিলাম। ইহা ছাড়া, আমরা দেখিতেছি যে বহুপ্রাচীন কাল হইতে এতাবৎ কাল পর্যন্ত রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর চিত্রকলা-চর্চায বিশেষ স্থান অধিকার করিযা আছে। যশোধর পণ্ডিত যিনি কামসূত্রের টীকাকার তিনি এই জয়পুরাধিপতি প্রথম-জয়সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং চিত্রের যে ষড়ঙ্গ জয়পুর-চিত্রকরগণের মধ্যে আবহমানকাল প্রচলিত ছিল সেটির সন্ধান পাওয়া যশোধরের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল না। আমাদের ষড়ঙ্গ, যশোধরের বহু পূর্বে প্রাচীনকাল হইতেই ভারতশিল্পীগণের নিকট সুবিদিত ছিল; কেননা, দেখিতে পাই, খৃস্টীয় ৪৭৯ হইতে ৫০১ শতাব্দীর মধ্যে চীনদেশে শিল্পাচার্য Hsieh Ho চিত্রের যে ষড়ঙ্গ (Six Canons) লিপিবদ্ধ করেন তাহা কার্যত আমাদের ষড়ঙ্গেরই অনুরূপ। ইহা ছাড়া আমরা আরও দেখি যে, চীনদেশে ৩০০ খৃস্ট-অব্দে অমিতাভ বুদ্ধমূর্তি সর্বপ্রথম চীন শিল্পী Tai Kuei গঠন করেন। সুতরাং Hsieh Hoর পূর্ব হইতেই বৌদ্ধ শিল্পপদ্ধতি ও তাহার সহিত আমাদের চিত্রের ষড়ঙ্গও চীনদেশে নীত হওয়া আশ্চর্য নয়। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি ভারতবর্ষ ও চীন এই দুই মহাদেশে প্রচলিত চিত্রের ষড়ঙ্গ দুইটি যে নিকট-আত্মীয়,

তাহা নিম্নলিখিত চীন-ষড়ঙ্গের অনুবাদের সহিত আমাদের ষড়ঙ্গটি মিলাইলেই বুঝা যায়। চীনদেশের ষড়ঙ্গ[১], যথা—

1. Chi-yun Shêng-tung = Spiritual Tone and Life-movement
2. Ku-Fa Yung-pi = Manner of brush-work in drawing lines.
3. Ying-wu hasiang hsing = Form in its relation to objects.
4. Sui-lei Fu-tsai = Choice of colour appropriate to the objects.
5. Ching-ying Wei-chih = Composition and grouping.
6. Chuan-moi-hsieh = The copying of classic master-pieces.

—*Sei-Ichi Taki, The Kokka*, No. 244

চীন ষড়ঙ্গের উপরি-উক্ত ইংরাজী অনুবাদের সহিত চীনভাষাবিদ্ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ও জাপানের সুবিখ্যাত শিল্পরসিক ওকাকুরার অনুবাদের সম্পূর্ণ মিল নাই, সুতরাং সেগুলিও নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

1. Rhythmic vitality.
2. Anatomical structure.
3. Conformity with nature.
4. Suitability of colouring.

১ এই গ্রন্থে মুদ্রিত অধিকাংশ অনুবাদই লরেন্স বিনিয়ন লিখিত *The Flight of the Dragon* পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত আছে।

5. Artistic composition.
6. Finish.

—Giles, *Introduction to the History of Chinese Pictorial Art*, p. 24

1. Spiritual Element, Life's Motion.
2. Skeleton-drawing with the brush.
3. Correctness of outlines.
4. The colouring to correspond to nature of objects.
5. The correct division of space.
6. Copying models.

—Hirth, *Scraps from a Collector's Note-book*, p. 58

1. La consonance de l' esprit engendre le mouvement [de la vie].
2. La loi des os au moyen du pinceau.
3. La forme représentée dans la conformité avec les êtres.
4. Selon la similitude (des objets) distribuer la couleur.
5. Disposer les lignes et leur attribuer leur place hiérarchique.
6. Propager les formes en les faisant passer dans le dessin.

—Petrucci, *La Philosophie de la Nature dans l'Art de l'Extrême-Orient*, p. 89

1. Rhythmic vitality, or Spiritual Rhythm expressed in the movement of life.
2. The art of rendering the bones or anatomical structure by means of the brush.
3. The drawing of forms which answer to natural forms.
4. Appropriate distribution of the colours.
5. Composition and subordination, or grouping according to the hierarchy of things.
6. The transmission of classic models.

—Binyon, *The Flight of the Dragon*, p. 12-13

1. The Life-movement of the spirit through the Rhythm of Things . . . . the great Mood of the Universe, moving hither and thither amidst those harmonic laws of matter which are Rhythm.
2. The Law of Bones and Brush work. The creative spirit, according to this, in descending into a pictorial conception must take upon itself organic structure.

—Okakura, *Ideals of the East*, p. 52

চীনদেশের ষড়ঙ্গটি নানা মুনির নানা মতের কুহেলিকার ভিতর দিয়া কেমন ভাবে প্রকাশ পাইতেছে ও দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে সেটা কি ভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা যদিও আমাদের দেখিবার বিষয় এবং প্রাচ্য জগতের দুই মহাদেশে প্রচলিত দুই ষড়ঙ্গের মধ্যে কোন্‌টা প্রাচীনতর তাহারও মীমাংসা করা যদিও আমাদের কর্তব্য,

তথাপি চিত্র ও তাহার ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে যে স্বাধীন চিন্তা ও ধ্যানাদি বাৎস্যায়নের বহু পূর্ব হইতেই আমাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল তাহারই যথাসম্ভব আলোচনা আমাদের প্রধান লক্ষ্যস্থল।

পঞ্চদশীর চিত্রদীপ অধ্যায়ে শাস্ত্রকার চিত্রপটের অবস্থাচতুষ্টয় দিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ ও ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য নির্ণয় করিতেছেন। চিত্রকলা নিশ্চয়ই আমাদের দেশে শখের খেলা ছিল না, আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের সহিত তাহার নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল। চিত্রকলাকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে চক্ষে দেখিতেন এক চীন ও জাপান ছাড়া আর কোনো জাতি যে সে চক্ষে দেখিযাছে এমন মনে হয় না। চিত্রের এই ষডঙ্গটির প্রযোগ বহুকাল হইতে যে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল এবং সেটার সম্বন্ধে একটা চর্চা এখনকার কালেও যে আমাদের প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য; এবং আমরা নূতন করিযা যেমন চিত্রবিদ্যার চর্চা করিতে অগ্রসর হইয়াছি তেমনি চিত্রের ষড়ঙ্গটির সঙ্গেও নূতন করিয়া আর একবার পরিচয় করিয়া লওযা আমাদের আবশ্যক-বোধে ইংরাজি অনুবাদের সহিত ইহা প্রকাশ করিতেছি। যথা—

১ রূপভেদাঃ— Knowledge of appearances.

২ প্রমাণানি— Correct perception, measure and structure of forms.

৩ ভাবঃ— The action of feelings on forms.

৪ লাবণ্যযোজনম্— Infusion of grace, artistic representation.

৫ সাদৃশ্যম্— Similitudes.

৬ বর্ণিকাভঙ্গঃ— Artistic manner of using the brush and colours.

চিত্রযোগের এই ষড়ঙ্গসাধনের যথাসাধ্য বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ভারত ও চীন শিল্পাচার্যগণের নির্দিষ্ট দুই পন্থার পার্থক্য কতখানি সেটা জানা আবশ্যক। আমরা দেখিতেছি, ষড়ঙ্গ দুইটি পর্যায়ক্রমে পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে মিল না থাকিলেও দুয়ের একটা সামঞ্জস্য ধরিয়া লওয়া চলে। কিন্তু তাহা হইলেও দুইটিই যে একই বস্তু তাহা বলা চলে না। নদীর এপার ওপার দুই পারকে যেমন একই পার বলিতে পার না, তেমনি চিত্র সম্বন্ধে চিন্তাপ্রবাহটির দুই পারে যে এই দুইটি ষড়ঙ্গ তাহাদের একই বস্তু বলা যায় না— আমাদেরটি যেন কর্মের পার ও তাহাদেরটি যেন মর্মের পার; মাঝ দিয়া চিত্র সম্বন্ধে চিন্তাপ্রবাহটি কখনো এপার কখনো ওপার স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে।

দুইটি ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ এই পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে যেটুকু মিল বা যেটুকু অমিল দেখা যায় তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য হয় না। কিন্তু ষড়ঙ্গ দুইটির শীর্ষস্থান যেমন 'রূপভেদাঃ' এবং 'Rhythmic Vitality' (প্রাণছন্দ)— এই দুইটিতে যে আড়াআড়ি তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এখন বিচারের বিষয় এই যে, ছন্দ যাহাকে চীন শিল্পাচার্য চিত্রের প্রাণস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, সেই যথার্থই প্রয়োজনীয় কথাটি আমাদের ষড়ঙ্গকার উল্লেখ মাত্র না করিয়া রূপভেদকেই প্রাধান্য দেন কেন? আমাদের আচার্যগণ, দেখিতে পাই, যখন যে তত্ত্বটি লইয়া পড়িয়াছেন তখন সেটির গভীর হইতে গভীরতর, সূক্ষ্ম হইতে অতিসূক্ষ্ম দিকটি পর্যন্ত পর্যালোচনা করিয়া তবে ছাড়িয়াছেন। কেবল আলেখ্যতত্ত্বের বেলাই তাহার ব্যতিক্রম হয় কেন? আমাদের ষড়ঙ্গসূত্রটি যে কোনো বৃহৎ এক সূত্রের অংশ মাত্র তাহা বলা চলে না। কেননা স্পষ্টই বলা হইয়াছে, ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্— চিত্রের এই ছয় অঙ্গ— ইহা ছাড়া আর নাই।

প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ এই পাঁচ সাক্ষী এবং রূপভেদ এই সুমেরুটি দিয়া ষড়ঙ্গের যে জপমালাটি চিত্রসাধনার জন্য আমাদের শাস্ত্রকার গাঁথিয়া দিয়াছেন সে মালায় কোন্ মন্ত্র জপ করিবার উপদেশ রহিয়াছে তাহাই দেখিবার বিষয়। মালা ফিরাইবার কালে সাধকের অঙ্গুলি সুমেরু হইতে আরম্ভ করিয়া এক-এক সাক্ষীকে স্পর্শ করিয়া আবার সুমেরুতেই গিয়া বিশ্রাম করে; সুমেরুতেই জপের গতি আরম্ভ এবং সুমেরুতেই আসিয়া জপের মুক্তি বা স্থিতি। এখন দেখা যাইতেছে যে, চিত্রের গতি মুক্তি ষড়ঙ্গের সুমেরুতেই; সেই সুমেরু আমাদের শাস্ত্রকারের মতে 'রূপভেদাঃ', আর চীন শাস্ত্রকারের মতে 'Rhythmic Vitality' বা জীবনছন্দ। এখন এই দুই সুমেরু একই পদার্থ কি না, অথবা একই পর্বতের এপিঠ ওপিঠ কি না, সেটাই জানা আবশ্যক।

'রূপভেদ' আমাদের এবং 'জীবনছন্দ' চীনের যে মূলমন্ত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। রূপ এবং প্রাণ এই দুইটিই চিত্রের গোড়া এবং শেষ; প্রাণ প্রকাশ পাইবার জন্য রূপের আকাঙ্ক্ষা রাখে, রূপ বর্তিয়া রহিবার জন্য প্রাণের প্রতীক্ষা করে। শুধু রূপ লইয়া চিত্র হয় না; শুধু প্রাণ লইয়াও চিত্র হয় না। যদি বলা যায় শুধু রূপ তবে ভুল হয়; যদি বলা যায় শুধু প্রাণ তবেও ভুল হয়। এই জন্য চীন ষড়ঙ্গকার Vitality বা প্রাণের সঙ্গে Rhythm অর্থাৎ ছন্দ বা ছাঁদটি জুড়িয়া উভয় দিক বজায় রাখিয়াছেন, আর আমাদের ষড়ঙ্গকার শুধু 'রূপ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন না, বলিলেন 'রূপভেদাঃ'।

এখন এই 'ভেদ' কথাটি প্রয়োগের সার্থকতা বুঝা অথবা না-বুঝার উপরে আমাদের ষড়ঙ্গের জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে।

যদি আমরা রূপভেদের অর্থ ধরি তাবৎ সৃষ্টবস্তুর বিভিন্নতা, তবে আমাদের ষড়ঙ্গটি নির্জীব ও জড়সাধনার উপায় হইয়া পড়ে, কিন্তু চিত্র

তো জড়সামগ্রী নহে। চিত্র যে রচে এবং চিত্র যে দেখে উভয়ের জীবনের সহিত চিত্রিতের আত্মীয়তা, তা ছাড়া চিত্রের নিজেরও একটা সত্তা আছে। সুতরাং রূপভেদের অন্য অর্থ হওয়া সম্ভব কিনা তাহা দেখা কর্তব্য। 'ভেদ' শব্দ বিভিন্নতা বুঝাইতেই সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়, আবার হিন্দুস্থানীরা ভেদকে বস্তুর মর্ম বা রহস্য বলিয়া জানে। এখন 'রূপভেদাঃ' বলিতে এ-রূপে ও-রূপে ভেদাভেদ ইহা হইতে পারে, কিম্বা রূপের মর্মভেদ বা রহস্য উদ্‌ঘাটন ইহাও হয়। 'সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে।' কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে যে সদ্‌গুরু চিত্রের ষড়ঙ্গে 'রূপভেদাঃ' এই কথাটি বসাইয়াছেন তিনি রূপভেদের ভেদ বা রহস্যটুকু আমাদের খুলিয়া বলেন নাই; কিন্তু তথাপি রহস্যটুকু আমরা যে ধরিতে পারিতেছি না এমন নয়।

চিত্রকে আমাদের ষড়ঙ্গকার যে সজীব বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতেন তাহার প্রমাণ ষড়ঙ্গেই বিদ্যমান। চিত্রের ছয় অংশ নয়, ছয় দিকও নয়, ছয় অঙ্গ! আমাদের হাত পা ইত্যাদির মতো শক্তিশালী ছয় অঙ্গ দান করিয়া তবে ষড়ঙ্গকার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। শুধু ইহাই নয়; ষড়ঙ্গটির রচনাপ্রণালী দেখিলেও চিত্রটাকে ষড়ঙ্গকার যে একটা জীবনশক্তির প্রকাশ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং সেই প্রকাশের উপযুক্ত করিয়া ষড়ঙ্গ-সূত্রটিকে একটা সজীবতা দিয়া গড়িয়া যাওয়াই যে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল তাহাও বেশ বোঝা যায়। ষড়ঙ্গ-সূত্রটিকে ব্যাকরণের একটি নির্জীব সূত্রের মতো করিয়া ষড়ঙ্গকার গড়িয়া যান নাই; চিত্র যে ছয়ের সমষ্টি সেই ছয়টিকে কোনো প্রকারে কথায় গাঁথিয়া একটি সূত্র রচনা করাই যদি ষড়ঙ্গকারের উদ্দেশ্য হইত তবে আমরা দেখিতাম যে ব্যাকরণের 'সহর্ণের্ঘঃ' সূত্রের মতো ষড়ঙ্গটি খুব ছোট কাজেই দুর্বোধ আকারে দেখা দিয়াছে। কিন্তু এখানে দেখিতেছি, ষড়ঙ্গের একটি অঙ্গের সহিত

আর-একের যোগ এবং সম্বন্ধ ইত্যাদি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া, যেটির পরে যেটি আসা উচিত, যেখানে যাহার স্থান, সেইরূপভাবে তাহা সাজাইয়া, চিত্রের যেন একটা সজীব মন্ত্রমূর্তি খাড়া করা হইয়াছে। ষড়ঙ্গের সমস্তটির ভিতরে ছন্দের স্রোত বহাইয়া রূপভেদকে প্রমাণ-ভাবকে লাবণ্য-সাদৃশ্যকে বর্ণিকাভঙ্গ দিয়া ও সকল অঙ্গের সহিত সকলের একটি অকাট্য ও অবিরোধ সম্বন্ধ ঘটাইয়া ষড়ঙ্গটিকে এমন একটা পরিমিত গতি ও ভঙ্গী দেওয়া হইয়াছে যে ষড়ঙ্গটি একটা ছন্দে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবন্ত রূপে আমাদের কাছে প্রকাশ না পাইয়া থাকিতে পারে না।

রূপ প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা করে সুতরাং প্রমাণ আসিয়া রূপে মিলিয়াছে। অমনি ভাবের উদয়, লাবণ্যের সঞ্চার, সাদৃশ্যের গলাগলি ও বিচিত্র রঙ্গভঙ্গ! যেন নট ও নটী আমাদের চোখের সম্মুখে নৃত্য করিতেছে! ষড়ঙ্গটির এই স্বচ্ছন্দ গতিই সাক্ষ্য দিতেছে যে আমাদেরও ষড়ঙ্গের মূলে প্রাণের ছন্দ তরঙ্গায়িত, এবং রূপভেদের অর্থ শুধু আকারের বিভিন্নতা দেওয়া বা বোঝা নয়, কিন্তু আকার কোথায় সজীব কোথায় নির্জীব রূপে দেখা যাইতেছে তাহাই বোঝা ও বোঝানো।

চেতন-অচেতন উৎপত্তি-নিবৃত্তি ইহারই ছন্দে বিশ্বজগৎ বাঁধা। তেমনি জীবিত রূপ ও নির্জীব রূপ ইহারই লয়ে আমাদের ষডঙ্গটি বাঁধা। বস্তুরূপটি চেতনার স্পর্শে কখন কোথায় প্রাণবান, কোথায় বা চেতনার অভাবে সেটি ম্রিয়মাণ, ইহাই আমাদের ষড়ঙ্গের মূলমন্ত্র। আর ষড়ঙ্গের গোড়াতেই যে 'ভেদ' আর সব শেষে যে 'ভঙ্গ' শব্দ দুইটি রাখা হইয়াছে তাহারাই হইতেছে আমাদের ষড়ঙ্গ-মন্ত্রণাগারের দুই কুলুপ অথবা ডবল-তালা-বন্ধ দুই কবাট। ইহারই মধ্যে রূপকথার 'পরানভৃঙ্গের' মতো ষড়ঙ্গের ছয় কৌটার অন্তরালে চিত্রের ও চিত্রকরের প্রাণের রহস্যটুকু গোপন রহিয়াছে। ভেদ আর ভঙ্গ দুই কবাটকে বাহিরের দিকে টানিয়া

মিলাইলে বাহিরটাই দেখা যায়, মন্দিরের ভিতরটা আড়াল পড়ে; আবার সে দুটিকে একটু কষ্ট করিয়া ঠেলিয়া ভিতরের দিকে প্রবেশ করাইলে ভিতর বাহির হইয়া পড়ে, বাহিরটা ভিতরে গিয়া মেলে। এই ভেদ আর ভঙ্গের ওঠা-পড়ার ছন্দটিই হইতেছে ষড়ঙ্গের মরণ-বাঁচনের কাঠি এবং এই কাঠির স্বচ্ছন্দ প্রয়োগেই চিত্রকরের গুণপনা। তা ছাড়া ষড়ঙ্গকার 'যোজনম্' এই শব্দটি ষড়ঙ্গের ঠিক হৃদয়ের মাঝখানটিতে বসাইয়াছেন, ষড়ঙ্গের মস্তিষ্কে ভেদাভেদজ্ঞান, দুই পায়ের গতি স্থিতি মাঝে, যোগানন্দের হৃদয়গ্রন্থিটি দিয়া দুইকে এক করা হইয়াছে।

ভেদ আর ভঙ্গের মাঝে 'যোজনম্' কথাটি যেন সাদা কালো জুড়ি ঘোড়ার মুখের লাগাম। ডাহিনের ঘোড়া ডাহিনে যাইতে চাহিতেছে, বামের ঘোড়া বামেই দৌড়িতে চাহিতেছে, রথ আর কোনো দিকে অগ্রসর হইতেছে না, যেমনি যোজনের লাগামের টান পড়িয়াছে অমনি দুই ঘোড়ার মুখ এক হইবার দিকে ঝুঁকিয়া আসিয়াছে এবং সাদা কালো দুই ঘোড়া পাশাপাশি ভঙ্গিসহকারে সারথির মনোমত স্বচ্ছন্দ গতিতে মনোরথকে টানিয়া চলিয়াছে।

সারথি যেমন লাগামের ভিতর দিয়া নিজের ইচ্ছাশক্তিটুকু সঞ্চালিত করিয়া দুই অশ্বের উদ্দাম গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া যান, বাহন ও নিজের মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক স্থাপন করেন, শিল্পীও তেমনি বর্ণিকা বা বর্ণবর্তিকা, আমরা যাহাকে বলি তুলি, তাহারই টানটোনের ভিতর দিয়া নিজের ইচ্ছাশক্তি বা বাসনাকে প্রবাহিত করিয়া বিশ্বচরাচরের সহিত নিজের সৃষ্টি যে চিত্র এবং নিজেকেও এক ছাঁদে বাঁধিয়া চলেন। চিত্রের সহিত, চিত্র যে দেখে, চিত্র যে লেখে, এবং চিত্রে যাহাদের দেখা যায় তাহাদের পরস্পরের প্রাণের পরিচয় ঘটানোই দুই ষড়ঙ্গসাধনারই চরম লক্ষ্য।

চিত্রে ছন্দ ও রস

ইতি চিত্রম্ ষড়ঙ্গকম্ !

ছয়টি সুশিক্ষিত ঘোড়ার মতো ষড়ঙ্গ যাহাকে রথের ন্যায় আমাদের সম্মুখে বহন করিয়া চলিয়াছে সেই চিত্র কি ? তাহার নির্মাতা কে ? এবং সেই চিত্রবিচিত্র রথের অধিষ্ঠাতাই বা কোন্ দেবতা ?

প্রথমেই দেখা যাক চিত্র কাহাকে বলি। যাহাতে রূপের ভেদাভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ এই ছয়টি বর্তমান তাহাই চিত্র যদি এই কথা বল তবে আমার ঘরের মেঝেতে পাতা এই বিলাতি গালিচাখানিকেও চিত্র বলিতে হয়। কেননা ইহাতেও নানা ফুলফলের রূপভেদ, গালিচাখানির চতুষ্কোণ মানপ্রমাণ, গালিচায় লিখিত এক-এক ফুলের ও ফলের ভাব ও লাবণ্য, ঠিক টাটকা ফুলের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য এবং যাহার যে বর্ণটি তাহা পুরামাত্রাতেই দেখা যাইতেছে। যদি বল যে গালিচা দেওয়ালে খাটানো চলে না, পুস্তকেও দেওয়া চলে না, সুতরাং তাহা চিত্র নয়— কিন্তু আমি যদি চমৎকার সূক্ষ্ম করিয়া বুনিয়া একখানি গালিচা দেওয়ালে খাটাই অথবা পুস্তকে দিই, তখন কি হইবে তাহা চিত্র ? দেওয়ালে খাটাইলেই, পুস্তকে দিলেই চিত্র হয় না। তুলির দ্বারা যাহা চিত্রিত হয় তাহাই চিত্র। কিন্তু তুলির দ্বারা লাঠিমটি চিত্রিত হইয়াছে, তুলির দ্বারা ঘরখানি নানা বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তবে এগুলিকে কি বলিবে চিত্র ? সুতরাং দেখ, যাহাই তুলি দিয়া চিত্রিত হয়, মৃত্তিকা কিম্বা কাষ্ঠ কিম্বা একখণ্ড বস্ত্র, তাহাই চিত্র নয়; কিম্বা বাহ্যবস্তুর নকল যেমন ফটোগ্রাফ বা এই বিলাতি গালিচা, ইহাও চিত্র নয়।

অভিধান লিখিলেন, চীয়তে ইতি চিত্রম্। চিত্রকর চয়ন করেন সত্য, বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ উভয়ের ভাব চয়ন করেন, লাবণ্য চয়ন করেন, রূপ প্রমাণ সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ চয়ন করেন। কিন্তু এই চয়নকার্য কিম্বা এই চয়নের সমষ্টিকেও তো চিত্র বলিতে পার না। ফুল বাছিয়া সাজি ভরানো মালীর বাহাদুরি, কিন্তু সেই বাহাদুরিটুকু তো চিত্রের সব নয়। পাঁচটা সংগ্রহ একত্র করিয়া প্রকাশ করিলে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ প্রস্তুত হয়, চিত্র তো হয় না। কাজেই বলিতে হইতেছে যে চিত্রকরের চয়নের স্বাভাবিক পরিণতি যে চিত্তহরণ অকৃত্রিম ষড়ঙ্গমালা তাহাই চিত্র।

বাহিরে বিশ্বজগৎ, রূপে রসে শব্দে স্পর্শে গন্ধে ছায়াতপে আলো-আঁধারে পাঁচ ফুলের মালঞ্চের মতো প্রকাশ পাইতেছে; অন্তরে পদ্ম-সরোবর, সুখ-দুঃখ আনন্দ-অবসাদ ভাব-ভক্তির সুরে লয়ে লহরীতে ভরপুর রহিয়াছে; চিত্রকর এতদুভয়ের মধ্যে যাতায়াত করিয়া পুষ্প-চয়ন করিতেছেন ও মননসূত্র দিয়া অপূর্ব হার গাঁথিতেছেন এবং সেই হারে সাজাইয়া পুষ্পকরথ নির্মাণ করিতেছেন। কিন্তু কাহাকে বহন করিবার জন্য, কোন্ দেবতাকে মালা পরাইয়া এই রথে অধিষ্ঠিত করিয়া আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়া দিবার জন্য? আমি বলি, আত্ম-দেবতাকে, চিত্রকরের নিজের আত্মাকে। এই আত্মা যদি পটে চিত্রিত বা অধিষ্ঠিত রহেন তবে তাহাই চিত্র; যদি গালিচায় অধিষ্ঠিত হয়েন তবে তাহাই চিত্র; যদি গৃহভিত্তিতে অথবা যদি গ্রন্থের কাগজে অধিষ্ঠিত হয়েন তবে তাহাও চিত্র।

আত্মা আত্মীয়তার জন্য ব্যাকুল; চারি দিকের আত্মীয়তার ভিতর আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহার ভিতরে বিপুল একটা প্রকাশ-বেদনা উদয় হইয়া নিয়ত কার্য করিতেছে। এই প্রকাশবেদনের, এই

উদয়ের অভিব্যক্তিই হইতেছে চিত্র। এই উদয়ের রঙ, এই বেদনের শোণিমা যখন আসিয়া সাদা কাগজকে রাঙাইতেছে, তাহাকে রূপ দিতেছে, প্রমাণ দিতেছে, ভাব লাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ দিতেছে, তখনই হইতেছে চিত্র। সূর্য উদয় হইতেছেন কোন্ অন্ধকারের অন্তরালে তাহা কে জানে? আমরা তখনি তাঁহাকে দেখি যখন উদয়ের রশ্মিজালে আকাশপটকে রাঙাইয়া তুলিয়াছেন; যখন সূর্যোদয় জলস্থল-অন্তরীক্ষের বিচিত্র রূপ-প্রমাণ-ভাব-লাবণ্যাদিকে সোনার এক জাগ্রৎ স্বপ্নে উদ্বোধিত করিয়া আপনার উদ্বোধন আমাদের জানাইতেছে। সুতরাং দেখিতেছি চিত্র যাহা তাহার গোড়াতে হইতেছে গোপন একটি উদয়-উৎস যাহার ভিতরে প্রকাশবেদন আছে, আর শেষ একটি অনির্বচনীয় রসোদয় যেখানে হইতেছে চিত্রের পরিণতি। এবং এই দুই উদয়ের মধ্যে আছে রূপ ভাব লাবণ্য ইত্যাদির ছন্দ ছাদ ছাঁচ বা আচ্ছাদন। চিত্র হয় তখন যখন চিত্রকরের অন্তর্নিহিত উদয়বাসনা বা প্রকাশবেদনা ছন্দের নিয়মে আপনাকে বাঁধিয়া অন্তর্বাহ্য দুই রূপে নিজেকে সংগত করিয়া রসোদয়ে পরিণত হয়। শব্দচিত্র, সংগীত, বাচ্যচিত্র, কবিতা, দৃশ্যচিত্র, পট ও মূর্তি ইত্যাদি কেহই সৃষ্টির এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অনুসরণ না করিয়া প্রকাশ পাইতেই পারে না। যদি কিছু এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে অতিক্রম করিয়া উদয় হয় তাহাকে বলিব না সংগীত, কবিতা কিম্বা চিত্র; তাহাকে পাগলের খেয়াল, মাতালের প্রলাপ বলিতে পারি। পাগলের এবং মাতালের অন্তরের উৎকট প্রকাশবেদনা, উদয়বাসনা কিছুতেই আপনাকে ছন্দে বাঁধিতে পারিতেছে না, ছন্দের আবরণ ও আচ্ছাদন সে দূরে ফেলিয়া উলঙ্গ হইয়া দেখা দিতেছে; কাজেই বেদনাতেই তাহার পরিসমাপ্তি, রসোদয়ের আনন্দে নয়।

চিত্র প্রথমোদয়ে বা প্রকাশবেদনের অবস্থায় অরুণ বা অব্যক্তরাগ, শব্দরহিত, উদয়ের দ্বিতীয় অবস্থায় সে প্রন্যূন, ছন্দের মধ্যে সংপ্রেষিত প্রচলিত বা কল্পিত; আর উদয়ের তৃতীয় অবস্থায় সে অনূন, অখণ্ড সমগ্র অর্থাৎ রূপে প্রমাণে ভাবে লাবণ্যে সাদৃশ্যে বর্ণিকাভঙ্গে পরিপূর্ণ সূর্যের ন্যায় অখণ্ডমণ্ডলাকারে উদিত।

এখন দেখা যাইতেছে চিত্রের প্রথমোদয় এবং পূর্ণোদয়ের ঠিক মধ্যস্থানটিতে আছেন ছন্দ— উষার ন্যায় দীপ্তিমতী, শোভার জন্য জলোর্মির ন্যায় উত্থিতা— সমস্ত স্থান সুপথবিশিষ্ট ও সুখে-গমনযোগ্য করিয়া। চিত্রকরের মনের প্রকাশবেদন এবং চিত্রের প্রকাশ, ইহারই মাঝখানটিতে উষার আনন্দকাকলীর মতো ছন্দ, এইজন্য ছন্দকে বলা হইয়াছে, চন্দয়তি ইতি ছন্দ। কেননা ইনি আনন্দিত করেন। ইনি উদয়ের উন্মেষ এবং উদয়ের শেষ এই দুয়ের শুভদৃষ্টির উপরে প্রচ্ছদপটখানির মতো দোদুল্যমান; সেই জন্য বলা হইয়াছে, আচ্ছাদয়তি ইতি ছন্দ। উষার ভিতরে যেমন উদয়ের অভিপ্রায় নিহিত রহে তেমনি ছন্দের ভিতর দিয়া চিত্রকরের মনোভিপ্রায় আপনাকে ব্যক্ত করে, সেই জন্য ছন্দকেই বলা হয় 'অভিপ্রায়'। এখন দেখিতেছি, ছন্দ সে আনন্দকারী, ছন্দ সে আচ্ছাদনকারী। ছন্দ অভিপ্রায়, ছন্দ অভিপ্রায়কে বাহিত করিবার সুপথ, ছন্দ নদীজলে তরঙ্গমালার শোভা। ছন্দস্তু নানাবিধম্। ছন্দ বহুবিধ, রূপের প্রমাণের ভাবের লাবণ্যের সাদৃশ্যের বর্ণিকাভঙ্গের ছন্দ। ছন্দ ছাঁদ বা ছাঁচ। ছন্দ ছাঁদিয়া বাঁধা বা বাঁধাছাঁদা। ছন্দ কিসে নাই? কোথায় নাই? ছন্দ ছেঁদো কথায়, ছন্দ ছাঁদনা-তলায়, ছন্দ নববধূটির তাড় ও কঙ্কণের রিনিঝিনির মাঝখানে; ছন্দ সমুদ্র ও চন্দ্রের পূর্ণমিলনে, ছন্দ দিনমণির বিরহে, কমলিনীর ম্লানমুখে, ছন্দ আহ্লাদে, বিষাদে, শুষ্কতায়, পূর্ণতায়, ছন্দ হাসিকান্নাভরা ধরা

পূর্ণিমা অমাবস্যা— শীতে বসন্তে জগৎ জুড়িয়া উঠিতেছে পড়িতেছে। ছন্দ আমাদের নিজের নিজের মনে; ছন্দ বাহিরে বিশ্বজগতে এককে অনেকে, অনেককে একে মিলাইয়া।

তুম হম দো তুম্ব বীচ স্বর
বাজৈ তাজা তাজা।
উজর কবহি কাজর কবহি
রঙ্গ রঙ্গ নিত বাজা।

অন্তর এবং বাহির এই দুই তুম্বির মাঝে অসীম বিরহ, অনন্ত মিলন নূতন নূতন ছাঁদে বাঁধা পড়িয়া বর্ণ গন্ধ শব্দ স্পর্শ ইত্যাদির বৈচিত্র্যে যেন আলোছায়ার রূপ ধরিয়া ঝংকৃত হইতেছে, তরঙ্গায়িত হইতেছে। এই তরঙ্গ, এই ঝংকৃতিই হয় ছন্দ। এবং কবি ও চিত্রকার এই তরঙ্গিত ঝংকৃত রেখা ও লেখার বর্ণমালার বরমাল্যে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রূপে রস, রসে রূপ সম্প্রদান করেন। অন্তর বাহিরের দিকে এবং বাহির অন্তরের দিকে হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিতেছে; এই দুই হাত যেখানে আসিয়া বাঁধা পড়িতেছে সেইখানেই রহিয়াছে ছন্দমালাটি দোদুল্যমান। এক স্বর প্রাণের কূল হইতে অকূলের দিকে ছুটিয়াছে, আর-এক স্বর কোন্ অকূল হইতে প্রাণের কূলে আসিতে চাহিতেছে; এই দুই কূলের দুই স্বরের আকুলি-ব্যাকুলি যেখানে আসিয়া মিলিতেছে সেইখানেই দেখি ছন্দের শুভ্র তরঙ্গমালা রূপ ধরিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, গড়াইয়া পড়িতেছে। অন্তর হইতে পিচকারি ছুটিয়া বাহিরকে রাঙাইতেছে, বাহির হইতে পিচকারি আসিয়া অন্তরকে রাঙাইতেছে; এই ছুটিয়া বাহির হওয়া ও ছুটিয়া ভিতরে আসার মধ্যে যে দোল দোলা বা দোললীলা তাহাকেই বলি ছন্দ।

আমরা যে লোকে বাস করিতেছি তাহাকে বলা হয় ব্রহ্মলোক।

এখানকার যাহা কিছু সকলই ছায়াতপ দিয়া আমাদের গোচরে আসে। ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে। সুতরাং ছন্দটিও দেখি ছাঁদ এবং বাঁধ এই ছায়াতপে আমাদের নিকট প্রকাশ পাইতেছে। ছন্দের ছায়ার দিকটি যেন বধূ, অনেকটাই অবগুণ্ঠনে ঢাকা; আর আতপের দিকটি যেন বর, গোপনতার লেশমাত্র তাহাতে নাই। ছন্দের এই ছায়াতপের যুগলমিলন ও সমস্ত রহস্যটির চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত আমরা ঘরে ঘরে ছাঁদনাতলায় বরবধূকে ছাঁদিয়া বাঁধার আদ্যন্ত ব্যাপারটির মধ্যে পাইয়া থাকি। ছাঁদনাতলা আচ্ছাদনতলা বা ছন্দস্থলীতে যে ব্যাপারটা ঘটে তাহাকে বলা হয় ছাঁদনি-নাড়া— ছন্দনী শক্তিকে নাড়া দিয়া জাগাইয়া তোলা বা ছন্দের নাড়া (মঙ্গলসূত্র) বাঁধা।

এই ছাঁদনাতলা বা ছন্দস্থলী পাতা হয় বাড়ির উঠানে গৃহস্থালীর সাত মহলের সাত ছন্দেব যেন প্রাচীর ঘেরিয়া। আর মাথার উপরে থাকে একেবারে খোলা আকাশের চন্দ্রাতপ, লক্ষ কোটি গ্রহ-উপগ্রহের বিরাট ছন্দে দোদুল্যমান; পায়ের নিচে রহে সমস্ত উঠান জুড়িয়া রেখা ও বর্ণের ছন্দে বাঁধা পদ্ম ও ভ্রমরের, নয় তো রাজহংস-মৃণালের, চক্রবাক-চক্রবাকীর মিলনবিরহের ছন্দকল্পনাটি।

এই ছন্দবন্ধন ব্যাপারের সমস্তটুকু যাঁহারা পরিণীতা এমন রমণীদিগের দ্বারাই নির্বাহ হওয়া বিধেয়; কুমারী কিম্বা বিধবা যাঁহার জীবনছন্দ অন্য একটি জীবনছন্দে গিয়া এখনো মিলিত হয় নাই বা মিলিয়া আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে এরূপ কাহাকেও এই ব্যাপারে যোগ দিতে দেওয়া হয় না।

প্রথমেই বর বা ছন্দের আতপের দিকটিকে সভায় আনিবার পথে ধুতুরার বা নবরসের নেশার, নয় তো সাত বর্ণের বা সাত সুরের ত্রিসপ্তকের সংখ্যানুসারে, নয় সাত কিম্বা একুশ প্রদীপ কুলায় সাজাইয়া বরের মাথার উপর দিয়া লাজাঞ্জলি বা পুষ্পবৃষ্টির মতো নিক্ষিপ্ত হয়।

তার পর বরকে ছাঁদনতলায় রাখিয়া রমণীগণ অপরিণত নবাগত ছন্দটির অন্তর বাহির দুই ছাঁদেরই মাপটুকু গ্রহণ করেন ; প্রথমে একটি সরল বেণুযষ্টি দিয়া ছন্দটির হ্রস্ব দীর্ঘ প্রমাণ, তৎপরে নিমুখ লতা যাহার কাঁটা নাই ও যাহার পাতার মুখ সূচ্যগ্র ও তীক্ষ্ণ নয় এমন একটি লতাবল্লরী দিয়া ছন্দের ভঙ্গিটুকু ও পরিশেষে একগাছি রঞ্জিত মানসূত্র দিয়া ছন্দের অন্তরের রঙ ও গভীরতা— জলে যেন রশি ফেলিয়া— দেখিয়া লওয়া হয়। অন্তরের এই মানসূত্র যিনি রঞ্জিত করেন তিনিও সধবা বা পরিণীতা ছন্দ। তারপর যেন বর্গের পাঁচ পাঁচ অক্ষরকেই ছন্দটির সহিত একত্র গাঁথিয়া পাঁচ পান, পাঁচ ফল, পাঁচখানি আল্‌তা ইত্যাদি দিয়া লতা এবং রক্তসূত্র— যেন প্রমাণ লাবণ্য এবং ভাব দিয়াই ছন্দের বন্ধন করা— বরের হাত বাঁধা হয়। ইহার পরে সমস্ত ছন্দটিকে যেন সুশীতল মাধুর্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার উদ্দেশেই দুই রমণীতে— স্বামীসোহাগিনী বলিয়া যাঁহাদের খ্যাতি আছে এমন দুই রমণীতে— মিষ্টান্ন মুখে দিয়া বা মাধুর্যরসের আস্বাদ লইতে লইতেই নিরালায় বসিয়া 'আই আমলা'— সখীর প্রেমের মধ্যে যে সুশীতল অম্লরসটুকু তাহাকেই যেন বণ্টন করিয়া মাধুর্যে মিশাইয়া যে অমৃতরসটুকু প্রস্তুত করিয়া রাখেন তাহাই সাতটি পানে রাখিয়া যেন বর্ণসপ্তকে ও সুরসপ্তকে মিলাইয়া বরকে বা ছন্দকে শ্রবণ আঘ্রাণ দর্শন স্পর্শন করানো হয়। যেন বলা হয়, ছন্দ তুমি মধুর হও ; তোমার রূপ, তোমার স্পর্শ, ধ্বনি ও সৌরভ মধুর হোক ; তোমার স্বাদ মধুর হোক, তোমার আপাদমস্তক, অন্তর-বাহির মধুর ও শীতল হইয়া রহুক। এইরূপে বর বা ছন্দকে মাধুর্য প্রদান করিয়া, সাত রমণী বা সপ্ত ছন্দ এক-একজন এক-একটি রাং-চিত্রের আলোকবর্তিকা লইয়া জ্যোতির এক ছন্দমালার মতো বরকে সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া ছাঁদন-তলার বা ছন্দ-বাঁধার প্রথম রীত সম্পন্ন করেন।

ছাঁদনতলার দ্বিতীয় রীতে ছন্দবন্ধন ব্যাপারটি স্পষ্টতর হইয়া আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। এই রীতের প্রথম অঙ্কে হয় সাত পাক; প্রথমা জলের ঝারি লইয়া জলোর্মির ছন্দে, দ্বিতীয়া সাতটি আলোক-বর্তিকা লইয়া সূর্যের সপ্ত-রশ্মির ছন্দে, তৃতীয়া শ্রী লইয়া, চতুর্থী মধ্যমা বা প্রধানা একটি আচ্ছাদিত ভাণ্ডে জ্বলন্ত প্রদীপ— মঙ্গল-ভাঁড় বা বউ-ভাঁড় কিম্বা আইভাঁড়— যেন নববধূর মনের গোপন ছন্দকেই বহন করিয়া, পঞ্চমা বরণডালা যেন ষড়-ঋতুর বর্ণিকাভঙ্গের সবটুকু ছন্দ লইয়া, ষষ্ঠী শঙ্খধ্বনির মঙ্গল ছন্দটি বহিয়া এবং সপ্তমা উলু দিয়া বা বাণীর ঝংকার রচিয়া সাত পাকে বরকে বেষ্টন করেন।

এই রীতের দ্বিতীয় অঙ্কে সাত ছন্দের এক-একটি দিয়া বরণ। ইহার প্রথমেই জলহাত বা জলোর্মি এবং সব-শেষে নয় প্রদীপের সেঁক বা নবরসের অভিসিঞ্চন।

তৃতীয় অঙ্কে কন্যাকে বা অনূঢ়া ছন্দকে বরের দিকে, বায়ুতরঙ্গের ছন্দটির উপর দিয়াই চারি পুরুষ-ছন্দ চারি বেদ বা ছন্দস্‌গণ বহন করিয়া আনেন আচ্ছাদন (ছন্দের ?) আড়াল দিয়া এবং বধূছন্দ বা ছন্দের ছায়ার দিকটিকে লইয়া বরছন্দ বা ছন্দের আতপের দিকটিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করান। পিতার সহিত কন্যার মনের ছন্দ, ভাবের ছন্দ যেন হইতেছে ছিন্ন সেই কারণেই পিতা-মাতা ইঁহারা এ সময়ে কন্যাছন্দকে বহন করেন না।

রীতের চতুর্থ অঙ্কে শুভদৃষ্টি। এপারে যাহা ওপারে যাহা তাহাদের শুভদৃষ্টি— ছায়াতপের শুভদৃষ্টি— আচ্ছাদনকে (ছন্দকে) মাথায় ধরিয়া।

পঞ্চম অঙ্কে মালা-বদল বা দুই পারের অথবা ছায়াতপের গান্ধর্ব-পরিণয়ে ছন্দবন্ধন সার্থক হয়। যথাপ্সু পরীবদ দৃশে তথা গন্ধর্বলোকে— গন্ধর্বলোকে সমস্তই যেমন বায়ু-তরঙ্গের, শব্দ-তরঙ্গের, রস-তরঙ্গের উপরে

তরঙ্গিত ভাবে দেখা দেয় তেমনি ছাঁদনাতলার এই গন্ধর্বপরিণয়ের সমস্তটা ছন্দময়-একটা-হিল্লোলের ভিতর দিয়া যেন ছন্দকেই আমাদের গোচরে আনিতেছে দেখি।

এদেশে স্ত্রীলোকদের হাতে পরিবার অনেকগুলি গহনা আছে, তাহার মধ্যে একটির নাম হইতেছে ছঁদ্ বা ছন্দ। এই ছঁদটি ধারণ করিবার নিয়মে এবং এই আভরণটির গঠনকল্পনাতে ছন্দ ও ছন্দবোধের সমস্ত রহস্যটুকু নিহিত রহিয়াছে দেখিতে পাই। প্রথমত ছঁদটির গঠন একটি পূর্ণচন্দ্র এবং একটি বিকশিত পদ্মফুল পরে পরে সাজাইয়া— যেন অরুণোদয়ের ছন্দ এবং চন্দ্রোদয়ের ছন্দের সহিত পদ্মের ছন্দটির গোপন-সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া। তার পরে ছঁদটি পরিধানের নিয়ম হইতেছে— একদিকে টাড়[১] অর্থাৎ তট তাহার কোলে তিন জলতরঙ্গ চুড়ি, আর-একদিকে পহুঁছা এবং কঙ্কণ তাহাব কোলে আর তিন জলতরঙ্গ। দুই দিকে দুই ভূষণতরঙ্গ ও তাহার দুই কূল-উপকূলের ঠিক মাঝখানটিতে থাকে ছঁদ্ বা ছন্দটি— দুই কূলের মিলন ঘটাইয়া— টাঁড় ও কঙ্কণের উভয় ঝঙ্কারকে একটি সুমধুর নিক্কণে নিয়ন্ত্রিত কবিয়া। এই ছঁদটি না দিয়া ভূষণ পরা যেমন, আর ছন্দ না দিয়া চিত্রলেখাও তেমনি অশোভন।

অলংকার পরিধানের আর-একটি নিয়মে আমাদের দেশের সেকালের স্ত্রীলোকদের ছন্দজ্ঞানের পরিচয় আমরা পাইতেছি। সমস্ত গহনা পরিয়া সমস্তটির চাকচিক্যের উপরে অতি সূক্ষ্ম মলমলের আচ্ছাদন দেওয়া সেকালে প্রথা ছিল— যেন আভরণের পূর্ণপ্রকাশের মাঝে শুভ্রবর্ণা উষার আবরণ আচ্ছাদন বা ছন্দটি।'

এই ছন্দকে পরিত্যাগ করিলে ঘরে ছিরিছাঁদ থাকে না, কাজে

---

১ হিন্দিতে টাঁড়কে তট বলে।

ছিরিছাঁদ রহে না। ছাদ হইতেছেন শ্রী। তাঁহাকে বাঁধাই হইতেছে ছাঁদে বাঁধা বা শ্রীরাধিকার কানড়া-ছাঁদে কবরী বাঁধা। শুধু যে বাঁধা সে কষ্টের বাঁধা— হাতকড়ির বন্ধন। আর যে ছাঁদিয়া বাঁধা সে হইতেছে যেন শীত-গ্রীষ্মের মাঝে বসন্ততিলকের মত মনোহর। ছাঁদ না দিয়া যে বাঁধা তা কে না পারে? এক রসিক ছাড়া ছাঁদিয়া বাঁধা আর কাহারও কর্ম নয়।

> এত ছাঁদে কে না বাঁধে চুল
>
> তোমার চূড়ায় মজাইল জাতি কুল।· ·
>
> কে বা নাহি গাঁথে বনমালা
>
> তোমার মালায় সে এতেক কেন জ্বালা।···
>
> কে না থাকে ত্রিভঙ্গ হইয়া
>
> প্রাণ কান্দে এ রূপ হেরিয়া।···
>
> কে বা নাহি কহে কথাখানি
>
> তোমার চাঁদমুখে সুধা খসে জানি।

এই যে যাহা জাতিকুল মজায়, জ্বালা দেয়, প্রাণ কাঁদায়, মুখের কথায় সুধা খসায়, রূপকে ভঙ্গিমা দেয় তাহাই হইতেছে ছন্দ। এই ছন্দের শক্তি বোধ করা ও বোধ করানোই হইতেছে ছন্দবোধ এবং এই ছন্দশক্তিকে রূপ প্রমাণ ভাব লাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গে উদ্বোধিত করিয়া তোলাই হইতেছে চিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

এখন, চিত্রের প্রাণের প্রাণ যে রস তাহা কি? ছন্দ। যাহাকে চিত্রকারের চিত্ত হইতে চিত্রে এবং চিত্র হইতে আবার আমার চিত্তে বাহিত করিতেছে! রসো বৈ সঃ! রসনা, রসের আস্বাদ গ্রহণ করাই যাহার কাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে 'রস সে রসই'। বলিতে কহিতে রসনা কোনো কালেই নিরস্ত নয়, কিন্তু কেবল রসের বেলাই

সে বলিতেছে 'ব্যস্'। ছন্দের পরিণতি রসে, কিন্তু রসের পরিণতি কিসে? বলিতে হয় তাই বলি 'ব্যস্'-এ, নয় তো দুই ফোঁটা অশ্রুজলে। ইহা অপেক্ষা রসকে অধিকতর পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জো নাই। এই হল রস— এ কথা বলা চলে না। কেননা, স চ ন কার্যঃ নাপি জ্ঞাপ্যঃ! তবে কি সে আকাশ-কুসুমের মত অলীক? কখনোই না। রস যে হচ্ছে। রস যে পাচ্ছি! রস যে রয়েছে দেখছি। পুর ইব পরিস্ফুরন্— যেন সম্মুখে। হৃদয়মিব প্রবিশন্— যেন বুকের ভিতরে। সর্বাঙ্গীনমিবমালিঙ্গন্— সর্বাঙ্গ আলিঙ্গন ক'রে।

রসোন্মত্ত ময়ূরের সকল গায়ে রস মণিমাণিক্যের জ্যোতির মতো ফুটিয়া উঠিতেছে— এ যে চোখে দেখিতেছি, রসে তাহার বুক সুরাপাত্রের মতো ভরিয়া উঠিতেছে, রস তাহার বিচিত্র পিচ্ছের রোমে রোমে শিহরণ দিয়া নির্ঝরের মত ঝরিয়া পড়িতেছে! রসকে যে দেখিতেছি, রসকে যে শুনিতে পাইতেছি, কেমন করিয়া বলি রস অলীক? নব নব চিত্র, বিচিত্র রঙ্গ ও ভঙ্গ যে রসের শৃঙ্গারবেশ। অয়ম্ শৃঙ্গারাদিকো রসঃ অলৌকিকচমৎকারকারী— সে অলৌকিক এক চমৎকার সামগ্রী। সে রহিয়াছে, সে আসিতেছে। অন্যৎ সর্বমিব তিরোদধৎ— তাহার সম্মুখে কিছু আর তিষ্ঠিতে পারিতেছে না, রসে সব ভাসাইয়া লইতেছে, রসের মধ্যে সকলই ডুবিয়া যাইতেছে! বিরাট প্লাবনের মতো সকলের উপরে, ব্রহ্মস্বাদমিব অনুভাবয়ন্— যেন বৃহতের আস্বাদে আমাদেরও বড করিয়া তুলিয়া রহিয়াছে সেই প্রকাণ্ড আস্বাদ রস।

রস যখন চিত্রের সর্বস্ব, তাহার প্রাণেরও প্রাণ, তখন এক প্রাণ-রসনা ব্যতিরেকে আর কোনো ইন্দ্রিয়— না চক্ষু না শ্রোত্র-- চিত্রের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছে, চিত্রিতব্যের স্বাদ পাইতেছে। চিত্রের উৎপত্তি, চিত্রের পরিণতি, এই দুইটিই যখন রহিল প্রাণের ভিতরে,

তখন প্রাণ দিয়াই তাহাদের উভয়কে দেখিতে হয়, শুধু চোখ দিয়া নয়—এমন কি যেটুকু চোখে দেখিতেছি, হাতে ধরিতে পারিতেছি তাহাকেও চোখ দিয়া দেখা শুধু নয়, হাত দিয়া ছোঁয়া শুধু নয়—প্রাণ দিয়া দেখা, প্রাণ দিয়া স্পর্শ করা।

চোখে দেখে গায়ে ঠেকে ধুলো আর মাটি।
প্রাণরসনায় দেখ্‌রে চাইখা রসের সাঁই খাঁটি।
চোখে ধুলো আর মাটি, প্রাণে রসের সাঁই খাঁটি।

রূপের রসের ফুল ফুইটা যায়,
আমার পরান-সুতা কই?
বাইরে বাজে সাঁইয়ের বাঁশি,
আমি শুইনা আকুল হই।
আমার মিলনমালা হইল না রে,
লাজে পথ হাঁটি,
কেবল হাঁটি আর হাঁটি।

ভারত-ষড়ঙ্গ

১ রূপভেদ

রূপভেদাঃ— রূপে রূপে বিভিন্নতা, রূপের মর্মভেদ বা রহস্য-উদ্‌ঘাটন —জীবিত রূপ, নির্জিত রূপ, চাক্ষুষ রূপ. মানস রূপ, সু রূপ, কু রূপ ইত্যাদি।

মাযেব কোলে সব-প্রথম চোখ খুলিয়া অবধি আমরা রূপকেই দেখিতেছি। জ্যোতিঃ পশ্যতি রূপাণি। গ্রহনক্ষত্রের জ্যোতি রূপকে প্রকাশিত কবিতেছে, আত্মার জ্যোতি রূপকে প্রকাশিত দেখিতেছে— আলোকের ছন্দে, ভাবের ছন্দে— বহুধা বহু প্রকারে। যথা—

জ্যোতিঃ পশ্যতি রূপাণি রূপঞ্চ বহুধা স্মৃতম্
হ্রস্বো দীর্ঘস্তথা স্থূলশ্চতুরস্রোঽণুবৃত্তবান্ ॥৩৩
শুক্লঃ কৃষ্ণস্তথা রক্তঃ পীতো নীলোঽরুণস্তথা
কঠিনশ্চিক্কণঃ শ্লক্ষ্ণঃ পিচ্ছিলো মৃদুদারুণঃ ॥৩৪

—মহাভারত, শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্ম, ১৮৪ অধ্যায়

হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, চতুষ্কোণ ও নানা কোণ— যেমন ত্রিকোণ ষট্‌কোণ অষ্টকোণাদি এবং গোলাকৃতি অণ্ডাকৃতি, অথবা শ্বেত, কৃষ্ণ, নীলারুণ (বেগুনি) ও নানাবর্ণের মিশ্রিত রূপ, রক্ত-পীতাদি এক-এক স্বতন্ত্র বর্ণরূপ, কঠিন, চিক্কণ, শ্লক্ষ্ণ (সূক্ষ্ম, কৃশ, স্নিগ্ধ, স্বল্প), পিচ্ছিল অর্থাৎ পিছল যেমন কাদা, যেমন জল, পিচ্ছিল যেমন ছত্রাকার ময়ূরপিচ্ছ, মৃদু যেমন শিরীষফুল, দারুণ যেন লোহাব ভীম, ছোটবড রোগা-মোটা, কাটাছাঁটা, গোলগাল, কালোধলো, একরঙা, পাঁচরঙা, ইত্যাদি।

উপরের শ্লোকে যে ষোলো প্রকার রূপ কথিত হইয়াছে তাহার বিস্তার অশেষ। এই রূপের অসীমতা এক-এক পদার্থে বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন দেখা এবং এই অখণ্ড বিভিন্নতাকে একে সমাহিত অসীমে প্রতিষ্ঠিত দেখাই হইতেছে চক্ষুর এবং আত্মার কাজ। প্রথমে রূপের সহিত চোখের পরিচয়, ক্রমে তাহার সহিত আত্মার পরিচয়— ইহাই হইতেছে রূপভেদের গোড়ার কথা এবং শেষের কথা।

চক্ষু দিয়া যখন রূপভেদ বুঝিতে চলি তখন এক রূপের সহিত আর-এক রূপের তুলনা দিয়া দুয়ের পার্থক্য দেখিতে চলি— হ্রস্বকে দীর্ঘ দিয়া চতুষ্কোণকে নানাকোণ কিম্বা নিষ্কোণ দিয়া, কঠিনকে কোমল দিয়া, এবং এক বর্ণকে আর-এক বর্ণের পাশে দাঁড় করাইয়া। এরূপে কেবল চোখের দেখার দৃশ্যবস্তুটি তোমারও কাছে যেরূপ আমারও কাছে সেইরূপ। রমণীকে তুমিও দেখিতেছ রমণী, আমিও দেখিতেছি রমণী; তুমিও তাঁহাকে চিত্রিত করিতেছ যে রূপে আমিও চিত্রিত করিতেছি সেই রূপে, এবং এই ফটো-যন্ত্রটিও চিত্রিত করিতেছে সেই রূপে। সুতরাং কেবল চোখের সাহায্যে রূপটি চিত্রিত হইলে তোমার চিত্রিত, আমার চিত্রিত এবং ফটো-যন্ত্রের চিত্রিত রূপেতে বিভিন্নতা রহে না; বড়োজোর রূপটির তুমি দেখাইলে এক পাশ, আমি দেখাইলাম এক পাশ, সে দেখাইল আর-এক পাশ। হয়তো তুমি দেখাইলে এক রমণী জল তুলিতে চলিয়াছে, হয়তো আমি দেখাইলাম সেই রমণীটিই চুল বাঁধিতেছে এবং সে দেখাইল শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছে। অথবা আমাদের তিন জনের মধ্যেই একজন চিত্র করিয়া দেখাইলাম যে, তিন ভিন্ন ভিন্ন রমণী ঐ তিন কার্যে ব্যাপৃতা। কিন্তু এতটা করিয়াও কি বুঝাইতে পারিতেছি যে, এই রমণী মাতা, ইনি ঘরের বধূ বা এই ঘরের দাসী? বলিতে পার না যে, স্তন্যদানরতাই হইতেছেন মাতা, কেশরচনারতাই

হইতেছেন বধূ, এবং জল-আনয়ন-উদ্যতাই হইতেছেন দাসী, কেননা ধাত্রী যে সেও স্তন্য পান করায়, মাতা যে সেও কেশরচনা করে এবং বধূ যে সেও জল তুলিতে চলে। হয়তো তুমি, জল যে আনিতে চলিয়াছে তাহাকে একটু মলিন বেশ দিয়া, চুল যে বাঁধিতেছে তাহাকে সিন্দূরাদি দিয়া, কোনো প্রকারে বুঝাইলে যে, এই দাসী, এই বধূ! কিন্তু মাতৃরূপের বেলায় কি করিবে? সন্তানরূপের বেলায় কি করিবে? ছেলেটিকে কোলে দিয়াই তো বুঝাইতে পারিতেছ না ইনি মা, ইনি পুত্র— ইনি ধাত্রী নহেন, উনি পালিত পুত্রও নহেন। দুই কিশোরীকে পাশাপাশি বসাইয়া, ছবির নিচে না লিখিয়া দিয়া বুঝাইতে পার না তো— ইহারা ভগিনী, দুই প্রতিবেশিনী নয়। মলিন বেশ দিয়াই তো জোর করিয়া বলিতে পার না, ইনিই দাসী, ইনি দুঃখীর ঘরের লক্ষ্মীটি নন। সুতরাং দেখিতেছ— কায়ের ভিন্নতা, বেশের ভিন্নতা, এমন কি আকৃতির ভিন্নতা দিয়াও তুমি চিত্রিত রমণীরূপটির সত্তা, যেমন তাঁহার মাতৃত্ব ভগ্নীত্ব দাসীত্ব ইত্যাদি, সপ্রমাণ করিতে পারিতেছ না। বলিতে পার না যে, রূপে তাহার সত্তাদান অসম্ভব, যখন তোমার চোখের সম্মুখে রহিয়াছে র‍্যাফেলের মাতৃরূপ, আমাদের কৃষ্ণরাধার যুগলরূপ এবং পাষাণের রেখায় প্রকাশিত তেত্রিশ কোটি দিব্যরূপ।

কাজেই কেবল দুই চোখের উপর চিত্রে রূপভেদটি দেখাইবার সম্পূর্ণ ভার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না, কেননা চক্ষু কাজে ফাঁকি দিতে চাহিতেছে, রূপের সত্তাটি সে দেখিতে ও দেখাইতে সক্ষম নয়। কাজেই রমণীরূপটিকে সে নটীর মতো কখনো মলিন, কখনো উজ্জ্বল বেশে, কখনো তাহার কোলে ছেলে দিয়া, কখনো তাহার হাতে ঝাঁটা দিয়া বুঝাইতে চায় যে, ইনি দাসী, ইনি মাতা, ইনি রানী, ইনি মেথরানী! কিন্তু বিভিন্ন বেশের ভিতর দিয়া দেখা দিতেছেন সেই

নটীরূপ যিনি মাতাও নহেন, রানীও নহেন। সুতরাং দেখিতেছি চিত্রকরের পক্ষে একমাত্র চক্ষুর পথই উত্তম পথ নয়; কেননা রূপের বহিরঙ্গীণ ভিন্নতা ধরিতে ও ধরিয়া দিতে পারিলেও চক্ষু বিভিন্ন রূপের সত্তাকে অর্থাৎ রূপের আসল ভেদাভেদটাকে ধরিতে পারে না, ধরিয়া দিতেও পারে না। রূপের এই আসল ভেদ বা রূপের মর্ম, কেবল জ্ঞানচক্ষুর দ্বারাই আমরা ধরিতে পারি।

নমু জ্ঞানানি ভিত্তস্তামাকারস্ত ন ভিদ্যতে।

—পঞ্চদশী, দ্বৈতবিবেক

এই জ্ঞানই রূপকে যথার্থ ভেদ দিতেছে ভিন্ন ভিন্ন রূপের সত্তাকে প্রকাশিত করিয়া। মাতার স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে, ভূমিষ্ঠ হইয়া বাড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে, প্রতিদিনের হাসিকান্না ইত্যাদির ভিতর দিয়া যে সকল সত্তার জ্ঞান আমরা পাইয়াছি তাহাকেই রূপের ভিতরে প্রেরণ করাই হইতেছে রূপের মর্ম দেওয়া, জীবন দেওয়া, অথবা রূপের স্বরূপ বা স্বরূপ দেখানো। ইহার বিপরীতটাই হইতেছে রূপকে নির্জিত করা বা রূপকে অরূপ করা।

আমাদের রুচি অনুসারে আমরা রূপে সু কু দুই ভিন্নতা দিই। রুচি হইতেছে আমাদের মনের দীপ্তি বা চিরযৌবনশোভা। ইহারই দ্বারা রূপবান বস্তুমাত্রেরই রুচিরতা আমরা অনুভব করি। যাহারই মন আছে তাহারই রুচি আছে, তেমনি আকৃতিমাত্রেরই নিজের নিজের একটা রুচি বা দীপ্তি অথবা শোভা আছে; এই দুই রুচির মিলন যখনই হইতেছে তখনই দেখিতেছি সুরূপ; আর তদ্বিপরীতেই যেন দেখিতেছি রূপহীন। কথায় বলে, 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'! বস্তুরূপটি আমাদের সম্মুখে পড়িবামাত্র আমাদের মনের দীপ্তি বা রুচি, লণ্ঠনের আলোর মতো, বস্তুটির উপর গিয়া পড়ে এবং বস্তুর দীপ্তি বা শোভা আমাদের মনে আসিয়া

পড়ে। যদি বস্তুরূপের রুচি আমাদের রুচিসংগত না হয় তবে আমরা বস্তু হইতে নিজের দীপ্তি ঘুরাইয়া লই, যেন মুখই ফিরাইলাম, এবং বলি এ রূপটি কুরূপ, তদ্বিপরীতে আমরা দেখি বস্তুটি স্বরূপ। সুতরাং রূপ দেখিতে এবং রূপকে রেখাদির দ্বারা চিত্রিত করিয়া দেখাইতে হইলে এই রুচি, মনের দীপ্তি বা চিরযৌবনশোভাই হইতেছে চিত্রকরের একমাত্র সহায় এবং চিরসঙ্গী। সকল প্রদীপের দীপ্তি সমান হয় না, তেমনি সকল মানুষের অন্তঃকরণে এই রুচি সমভাবে উজ্জ্বল নহে। এইজন্য তোমার দেখায় এবং আমার দেখায়, আমার চিত্রিতে ও তোমার চিত্রিতে, রূপের প্রভেদ ঘটে ও উত্তমাধম ভেদাভেদ থাকে। এই মনের রুচি বা দীপ্তিকে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলাই হইতেছে রূপসাধনা। এই দীপ্তির প্রেরণা দিয়া চিত্রের রেখা দীপ্তিমতী, লিখিত আকৃতির রূপ দীপ্তিমতী করিয়া তোলাই হইতেছে ষড়ঙ্গের প্রথম ভেদাভেদ— রূপভেদ দখল করা।

ব্যঞ্জকো বা যথালোকো ব্যঙ্গ্যস্যাকারতামিয়াৎ।
সর্বার্থব্যঞ্জকত্বাদ্ধীরর্থাকারা প্রদৃশ্যতে॥

—পঞ্চদশী, দ্বৈতবিবেক

যখন দেখি সকল বস্তুর প্রকাশক আলোক যখন যে বস্তুকে প্রকাশ করিতেছে তখন সেই বস্তুর আকার প্রাপ্ত হইতেছে, নতুবা স্বরূপ প্রকাশ হইতেছে না, তেমনি সকল বস্তুর যাথার্থ্য-প্রকাশক অন্তঃকরণ যখন যে বস্তুর উপরে পড়ে তখন সেই বস্তুরই আকার প্রাপ্ত হয়, নচেৎ তদ্‌বস্তুর জ্ঞান হয় কিরূপে? শুধু চোখের দীপ্তি দিয়া রূপকে দেখা নয়, দেখানো নয়, মনের দীপ্তি দিয়া তাহাকে প্রকাশিত দেখিতে হইবে এবং প্রকাশও করিতে হইবে। এই জন্যই শুক্রাচার্য প্রতিমার লক্ষণ লিখিবার গোড়াতেই বলিয়াছেন— নান্যেন মার্গেণ প্রত্যক্ষেণাপি বা খলু। চোখ দিয়া রূপ দেখা নয়, লেখাও নয়।

২ প্রমাণ

প্রমাণানি— বস্তুরূপটির সম্বন্ধে প্রমা বা ভ্রমবিহীন জ্ঞানলাভ করা; বস্তুর নৈকট্য, দূরত্ব ও তাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ইত্যাদির মান পরিমাণ, এককথায় বস্তুর হাড়হদ্দ।

চোখ দেখিতেছে সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার, অথচ কয়েক-অঙ্গুলি-পরিমিত পটখানিতে আমায় সমুদ্র দেখাইতে হইবে। সমস্ত কাগজখানিকে নীলবর্ণে ডুবাইয়া বলিতে পারিতেছি না যে, এই সমুদ্র। কেননা সেখানি দেখাইতেছে একখানি চতুষ্কোণ নীল কাচ— একেবারে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র পদার্থ! অনন্তের কিছুমাত্র আভাস তাহাতে নাই। এই সময়েই আমরা সমুদ্রের অনন্ত বিস্তারকে আকাশ এবং তট এই দুই সীমা দিয়া পরিমিতি বা প্রমিতি দিতে চলি। আমরা তটকে পটের এতখানি, আকাশকে এতখানি স্থান অধিকার করিতে দিব ও বাকি স্থানটি সমুদ্রের জন্য ছাড়িয়া দিব— এই হইল আমাদের প্রমাতৃচৈতন্য বা প্রমার প্রথম কার্য। তাহার পরে প্রমার দ্বারা আমরা নিরূপণ করিতে বসি— বালুতটের সহিত সোনার আলোয় রঞ্জিত আকাশের পীত বর্ণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদ, দুয়ের মধ্যে স্বচ্ছতা ও কর্কশতার ভেদ এবং তট ও আকাশ দুয়ের সহিত জলের তরঙ্গিত-রূপ ও বর্ণের ভেদ, সমুদ্রের তরঙ্গমালার সহিত আকাশের মেঘমালার রূপভেদ ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকৃতিভেদ, বর্ণভেদ, দৈর্ঘ্যপ্রস্থবিস্তারাদির ভেদ, শুধু ইহাই নয়, ভাবের ভেদ পর্যন্ত! আকাশের নির্নিমেষ নীরবতা, সমুদ্রের সনির্ঘোষ চঞ্চলতা, এমন কি তটভূমির সহিষ্ণু নিশ্চলতাটি পর্যন্ত! পরিষ্কার আকাশের দীপ্তির গভীরতা, সুনীল জলের দীপ্তির গভীরতা এবং তটভূমিতে যে সন্ধ্যার আলোটি দীপ্তি পাইতেছে বা সমস্ত ছবিটির উপরে রাত্রির যে গভীরতাটুকু ঘনাইয়া আসিতেছে সেটুকু

পর্যন্ত প্রমার দ্বারা পরিমিতি দিয়া আমরা নিরূপণ করিয়া লই। তট সমুদ্র এবং আকাশ, ইহাদের মধ্যে দূরত্ব ও নৈকট্য ইহাও আমরা প্রমার সাহায্যে অনুমান করিয়া লই। এই প্রমা হইতেছেন, সান্ত এবং অনন্ত উভয়কে মাপিয়া লইবার, বুঝিয়া দেখিবার জন্য আমাদের অন্তঃকরণের আশ্চর্য মাপকাঠিটি। ইহা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রেরও মাপ দিতেছে, বৃহৎ হইতে বৃহতেরও মাপ দিতেছে, গভীর অগভীর দুয়েরই মাপ দিতেছে; রূপেরও মাপ দিতেছে, ভাবেরও মাপ দিতেছে, লাবণ্য সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ সকলেরই মাপ এবং জ্ঞান দিতেছে।

সঙ্গীতাচার্য ছেলেটিকে গান শিক্ষা দিতেছেন। ছেলেটির প্রমাতৃ-চৈতন্য তখনো অপরিস্ফুট অবস্থায় আছে। সুতরাং সুরটি সে যতবারই আবৃত্তি করিতে চাহিতেছে ততবারই সে ভুল করিতেছে; হয় কতকটা সুর চড়া হইতেছে, নয় তো কতকটা নরম হইতেছে; আর এদিকে বাঁধা সুরও বলিয়া চলিয়াছে ক্রমাগত— 'না, না, হইল না'। ইহার পর দেখি দিনের পর দিন এই সুরকে মাপিতে মাপিতে সুরটি সম্বন্ধে ছেলের প্রমাতৃচৈতন্য যেমনি সম্পূর্ণ জাগিয়াছে সেই দিনই গলার সুর আর তানপুরার সুর ঠিক মিলিয়া গেছে।

শুধু যে মানুষের মধ্যে এই প্রমা জন্মাবধি কাজ করিতেছে তাহা নয়; নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যেও ইহার পরিচয় পাইতেছি। কোথায় একটি পাতা খুস্ করিয়া নড়িয়াছে অমনি হরিণের মধ্যে যে প্রমা তাহা দুই কান পাতিয়া শব্দটির ওজন লইতেছে— সেটি পাতা নড়ার শব্দ কি কোনো অজ্ঞাত শত্রুর সতর্ক পদক্ষেপ! সেটি বাঘ অথবা সেটি মানুষ কিম্বা শশকাদির মতো কোনো ক্ষুদ্র জন্তু কি না! ইত্যাদি। সমস্ত শিকারী জন্তুর মধ্যে এই প্রমার প্রখরতা আমরা দেখিতে পাই। পাখিটি যেমনি গাছ হইতে ভূমিতে নামিয়াছে অমনি বিড়ালটি তাহার

দিকে চলিয়াছে— পায়ে পায়ে পাখি ও নিজের মধ্যে দূরত্বটুকু প্রমার দ্বারা মাপিতে মাপিতে। শেষে বিড়াল এমন জায়গায় আসিয়া দাঁড়ায় যেখান হইতে ঠিক এক লম্ফে সে পাখিটির উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে— একচুল মাপের এদিক ওদিক হইবার জো নাই। ঠিক কতখানি জোরে লম্ফটি দিতে হইবে তাহাও বিড়াল প্রমার সাহায্যে এই সময় ওজন করিয়া তবে কার্যে অগ্রসর হয়। এদিকে পাখিটিরও প্রমাতৃচৈতন্য ঘুমাইয়া নাই। সে বিড়ালের প্রমার দৌড়টা মাটিতে নামিয়া অবধি গ্রহণ করিতেছে এবং শত্রুর ও নিজের মধ্যের ব্যবধানটুকু অভ্রান্তরূপে নিরূপণ করিয়া নিজে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে— নানা পতঙ্গ শিকার করিয়া। পতঙ্গও যে পাখির প্রমার ও বিড়ালের প্রমার পদধ্বনি শুনিতেছে না এবং গর্তে লুকাইতেছে না তাহাই বা কে বলিল!

প্রমা যে কেবল দূর ও নৈকট্য বুঝায় তাহা নয়। সে কোন্ জিনিসটিকে কতখানি দেখাইলে সেটি মনোহর হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করে। তাজমহলের নির্মাতা যে স্থপতি তাহার প্রমা পাথরের গুম্বজটিকে কি এক পরিমিতি দিয়াছে যে ইহার মতো আর-একটি গুম্বজ ভুর্লভ। এই গুম্বজের পরিমাণ এক চুল এদিক ওদিক যদি করা যায় তবে দেখিবে শাজাহানের মর্মরস্বপ্ন বাণবিদ্ধ রাজহংসের মতো ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাজের মণিমাণিক্যের জন্য তাজ সুন্দর নয়, তাহার আশ্চর্য পরিমিতিই তাহাকে সুন্দর করিয়াছে। ইউরোপের বিখ্যাত মিলো'র 'ভিনস' মূর্তির হারানো ছুটি হাত এপর্যন্ত কেহ মিলাইয়া দিতে পারিল না সহস্র চেষ্টাতেও। কি আশ্চর্য পরিমিতিই অজ্ঞাত শিল্পীর প্রমা ভিনস-মূর্তিটিকে দিয়া গিয়াছে।

সুতরাং দেখিতেছি 'প্রমাণানি' কেবল অঙ্কশাস্ত্রের ইঞ্চি গজ ও ফুট

নয়। সে আমাদের প্রমাতৃচৈতন্য, যাহা অন্তর বাহির দুইকেই পরিমিতি দিতেছে।

মাতুর্মানাভিনিষ্পত্তির্নিষ্পন্নং মেয়মেতি তৎ।
মেয়াভিসঙ্গতং তচ্চ মেয়াভত্বং প্রপদ্যতে॥

—পঞ্চদশী, পরিচ্ছেদ ৪, শ্লোক ৩০

বস্তুরূপটি গোচরে আসিবামাত্র প্রমাতৃচৈতন্য হইতে অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া প্রমেয় বা বস্তুরূপটিকে গিয়া অধিকার করে; তখন ঐ অন্তঃকরণ, প্রমেয় যে বস্তুরূপ তাহাতে সংগত হইয়া তদাকারে পরিণত হয় অর্থাৎ, মন বস্তুরূপ ধারণ করে এবং বস্তুরূপ মনোময় হইয়া উঠে। সুতরাং দেখিতেছি, এক দিকে আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় এবং বহিরিন্দ্রিয় সকল, আর-এক দিকে অন্তর্বাহ্য দুই দুই বস্তুরূপ; এতদুভয়ের মধ্যে প্রমাতৃচৈতন্য হইতেছেন যেন মানদণ্ড বা মেরুদণ্ড। পূর্বাপরৌ তোয়নিধীব-গাহ্য। এই মানদণ্ডটি আমরা শিশুকাল হইতেই নানা বস্তুর উপরে প্রয়োগ করিতে করিতে তবে উচ্চ নীচ, দূর নিকট, সাদা কালো, জল স্থল ইত্যাদির ভেদাভেদজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই এবং নিত্য ব্যবহারের দ্বারা ইহাকে আমরা প্রখরতর করিয়া তুলি। কৃপাণকে অধিক দিন অব্যবহার্য অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলে তাহাতে যেমন মরিচা পড়িয়া সেটি অকর্মণ্য হইয়া যায়, তেমনি প্রমাতৃচৈতন্যের দ্বারা কাজ না হইলে তাহা তীক্ষ্ণতা হারাইয়া নিষ্প্রভ হইয়া রহে। বিড়ালশিশুটি ইঁদুর ধরিতে চলিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রমা নানা বস্তুর উপরে প্রয়োগের দ্বারা তখনো সুতীক্ষ্ণ হইয়া উঠে নাই, কাজেই সে পদে পদে ভুল করিতেছে— শিকারের দূরত্ব সম্বন্ধে এবং নিজের উল্লঙ্ঘনশক্তির ঝোঁকটুকুতে।

মানবশিশুর চিত্রিত বস্তুগুলির মধ্যেও আমরা এই প্রমা-প্রয়োগের তারতম্য লক্ষ্য করি। যেমন দুই বালক একটি হস্তী অঙ্কিত করিয়াছে;

হস্তীর মোটামুটি আকৃতি সম্বন্ধে দুজনেরই প্রমা ঠিক আন্দাজটি লইয়াছে— দুজনেই দেখিয়াছে শুঁড়টি, লেজটি, ঢাকের মত পেটটি। কিন্তু পায়ের বেলা কেহ দেখিয়াছে দুই, কেহ চার। দন্ত দুইটির বেলাও এইরূপ— একে দেখিয়াছে এক দাঁত, অন্যে দেখিয়াছে দুই, কেহ মোটেই দাঁত দেখে নাই। পায়ের গঠনের বেলাতেও দেখিতেছি এক শিশু বেশ একটু প্রমা প্রয়োগ করিয়া যদিও দুটি পা লিখিয়াছে কিন্তু দুটি পায়েরই স্তম্ভাকৃতি দিয়াছে ; অন্যে চারি পা লিখিয়াছে— পায়ের সংখ্যার বেলায় প্রমা প্রয়োগ করিয়া— কিন্তু পায়ের গঠনের বেলায় সে একেবারে অন্ধ রহিয়া গিয়াছে এবং চারিখানি কাঠি লিখিয়া হাতীর পা বুঝাইতে চাহিতেছে! ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকরের চিত্রেও এই প্রমাপ্রয়োগের তারতম্য লক্ষিত হয়। প্রমাকে সর্বদা জাগ্রত রাখাই হইতেছে ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় সাধনা। মাকড়সার মত চারিদিকে প্রমাজাল বিস্তার করিয়া নিজে মাঝখানটিতে বসিয়া আছি, আর বস্তুগুলি নিকটস্থ হইয়া জালে পড়িবা- মাত্র তাহার হাড়হদ্দের সঠিক খবর আমার কাছে নিমেষের মধ্যে পৌঁছিতেছে।

৩ ভাব

ভাবঃ — আকৃতির ভাবভঙ্গী, স্বভাব ও মনোভাব ইত্যাদি এবং ব্যঙ্গ্য।

> শরীরেন্দ্রিয়বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়কাঃ।
> ভাব বিভাবজনিতাশ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতাঃ।

শরীর এবং ইন্দ্রিয় সকলের বিকার-বিধায়ক হইতেছেন ভাব ; বিভাব- জনিত চিত্তবৃত্তি হইতেছেন ভাব। নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া। নির্বিকার চিত্তে ভাবই প্রথম বিক্রিয়া দান করেন।

চিত্ত স্বভাবত স্থির থাকিতে চাহিতেছে— মাটির পাত্রে এই জলটুকুর মতো। সে স্বভাবত নির্বিকার; বিশাল হ্রদের মতো সে স্বচ্ছ; তাহার নিজের কোনো বর্ণ নাই কিম্বা চঞ্চলতা নাই; ভাবই তাহাকে বর্ণ দিতেছে, চঞ্চলতা দিতেছে।

কোন্ সকালে বসন্তের বাতাস বহিয়াছে, আকাশের কোন্ প্রান্তে বর্ষার গুরুগুরু মৃদঙ্গ বাজিয়াছে, কোন্‌দিন শরতের অমল ধবল মেঘ দেখা দিয়াছে, শীতের শিহরণটি উত্তরের নিশ্বাসের সঙ্গে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আর অমনি এই চিত্তহ্রদের জল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে! এই ভাব উত্তমাধম-নির্বিচারে কেবল যে মানুষেরই চিত্তবিকার ঘটাইতেছে তাহা নয়, ভাবাবেশে পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা তাবৎই রোমাঞ্চিত হইতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে দেখি।

এই ভাবের কার্যটি আমরা চোখ দিয়া ধরিতে পারি। যেমন আকৃতির নানা ভঙ্গীতে। বসন্তে নূতন ফুল, কচি পাতার বর্ণের উৎকর্ষে ও তাহাদের সতেজ ভঙ্গীতে, ঝড়ের দিনে গাছের ঝুঁকিয়া পড়া শুইয়া পড়ার ভঙ্গীতে এবং সমুদ্রের তাণ্ডব-আস্ফালনে; তোমার গালে হাত দিয়া বসায়, চোখে আঁচল দিয়া কাঁদায়, তোমার আলুথালু বেশের ভঙ্গীতে, তোমার ছুটিযা চলায় বসিয়া থাকায়, তোমার চোখের পাতাটি নুইযা পড়ায়, তোমার অধরের একটু কম্পনে, ভ্রূর সামান্ত কুঞ্চনে, হাতখানি হাতে দিবার গালে দিবার ভঙ্গীতে।

চোখে আমরা ভাবকে দেখি ও দেখাই ভঙ্গী দিয়া— ত্রিভঙ্গ, সমভঙ্গ, অতিভঙ্গ ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত এবং অগণিত শাস্ত্রছাড়া সৃষ্টিছাড়া ভঙ্গী দিয়া। কিন্তু ভাবের ব্যঞ্জনা বা নিগূঢ় ভাবটি আমরা কেবল মন দিয়া অনুভব করিতে পারি। কোকিলের কণ্ঠ কি যে জানাইতেছে, শীতের কুহেলিকা কাহাকে ঢাকিয়া রহিয়াছে, শরতের মেঘের রথ কাহাকে যে

বহন করিয়া চলিয়াছে, আমার মধ্যে কাহার বেদনা বাহিরের বসন্তের সমস্ত আনন্দের বর্ণে বর্ণে দুঃখের কালিমা লেপন করিতেছে, কাহার আনন্দ অন্ধকারে আলো দিতেছে— তাহাকে দেখা চোখের সাধ্য নয়, মনের আয়ত্তাধীন। সুতরাং কেবল চোখে ভাবের কার্য যে ভঙ্গীটুকু পড়িতেছে কেবল সেইটুকুমাত্রই চিত্র করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না, কেননা এ রূপে ভাবের ব্যঞ্জনার দিকটি সম্পূর্ণ বাদ পড়িতেছে। চিত্রের কেবল স্ফুট দিকটি অর্থাৎ ভঙ্গীর দিকটি দেখাইলে চলে না, চিত্র অসম্পূর্ণ থাকে— ইঙ্গিতের অভাবে, ব্যঙ্গ্যের অভাবে। শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গ্যন্ত্ববরং স্মৃতম্। ব্যঙ্গ্য অভাবে শব্দচিত্র বাচ্যচিত্র এমন কি লিখিত চিত্রও অনুত্তম হইয়া পড়ে। ইদমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গে। চিত্রমাত্রই উত্তম হয় ব্যঙ্গ থাকিলে।

সুতরাং ভাবটি দেখিতেছি দুইমুখো সাপ! এক মুখ তাহার চোখে দেখিতেছি ও দেখাইতে পারিতেছি ভঙ্গী দিয়া— রেখার ভঙ্গী, বর্ণের ভঙ্গী, আকৃতির নানা ভঙ্গী দিয়া। কিন্তু সাপের আর-এক মুখ দেখিতেছি ব্যঙ্গ্য ও গূঢ়তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অন্ধকার রাত্রে গাছের তলায় ছায়ার মায়ার মতো সে দেখা দিতেছেও বটে, দেখা দিতেছে নাও বটে! কাজেই চিত্র করিবার সময় দেখাইব কতখানি এটাও যেমন ভাবিতে হইবে, দেখাইব না কতখানি তাহাও বিচার করিতে হইবে।

কি দিয়া ভাবের প্রচ্ছন্নতাকে বুঝাইব? প্রচ্ছন্ন যাহা তাহাকে খুলিয়া দেখাইলে তো সে আর প্রচ্ছন্ন রহে না। ছায়ার উপরে আতপের প্রয়োগ করিয়া ছায়াকে তো দেখাইতে পারি না— সে যে আতপ পাইলেই দূরে পালায়। কাজেই দেখিতেছি, ছায়া দেখাইতে হইলে আমরা যেমন আতপের সম্মুখে কোনো এক পদার্থ আড়াল করিয়া

ধরিয়া— যেমন গাছটি কিম্বা আমার হাতখানি ধরিয়া— দেখাই 'এই ছায়া', তেমনি চিত্রেও ব্যঞ্জনা দিই আমরা যেটা প্রচ্ছন্ন তাহার আর যেটা স্ফুট তাহার মাঝে কিছু একটা আড়াল দিয়া।

কুটিরটি আধখানি লিখিলাম, আর আধখানি গাছের আড়ালে ঢাকিয়া দিলাম; কুটিরের লেখা অংশটি কুটিরের ভঙ্গী বা কুটিরের ভাবেব প্রকাশের দিকটা আমাদের দেখাইল, আর গাছের আড়ালে ঢাকা কুটিরের প্রচ্ছন্ন অংশটুকু ইঙ্গিতে জানাইতে লাগিল কুটিরের ভিতরের ভাব, কুটিরবাসীর নানা লীলা। সেদিকটায় আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি নানা অলিখিত বস্তু।

মন কেমন কেমন করিতেছে, সুতরাং চোখে সকলই কেমন কেমন ঠেকিতেছে! এই ভাবটি কবিতায় খুলিয়া বলিতে গেলে দেখি কাব্য হয় না; সেখানে কবিকে না খুলিয়াই বলিতে হইতেছে—

স এব সুরভিঃ কালঃ স এব মলয়ানিলঃ।
সৈবেয়মবলা কিন্তু মনোঽন্যদিব দৃশ্যতে॥

সেই তো বসন্তকাল, সেই মলয় বাতাস, সেই তো এই প্রেয়সী! কিন্তু মন কেমন-কেমন করিতেছে, সকলই কেমন-কেমন দেখিতেছি! কেমন যে দেখিতেছি তাহা খুলিয়া বলিতে পারিতেছি না।

ভাবের ভঙ্গীর বা বাহিরের দিক চিত্রের রেখা বর্ণ ইত্যাদি দিয়া খুলিয়া বলা চলে, কিন্তু ভাবের ব্যঙ্গ্যের দিক বা অন্তরের দিক আবছায়া দিয়া ঢাকিয়া দেখানো ছাড়া উপায় নাই।

টানে যেটা প্রকাশ হয় না, টোনে তাহা প্রকাশ করে। 'বেলা গেল পারে যাবি না!' এ কথার লেখার টানে কি বা প্রকাশ হইল? কিছুই না। কিন্তু এই কথার টোনটুকুতেই লালাবাবুকে সংসারের পারে ভাসাইয়া লইয়া গেল। এই টোনকেই বলি ব্যঙ্গ্য।

চিত্রে ভঙ্গী দিয়া ভাব প্রকাশ করা সহজ; কিন্তু চিত্রিতের মধ্যে ব্যঙ্গ্যটি দেওয়া সহজ কার্য নহে। এই জলপাত্রটি যদি কাঙালের ইহা বুঝাইতে চাহি তবে জলপাত্রটির আকৃতিমাত্র লিখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না, কেননা সেরূপ জলপাত্র দেখি বহু ধনীগৃহেও আছে। নাহয় চিত্রিত করিয়া দেখাইলাম জলপাত্রটি মলিন ও বহু স্থানে বিদীর্ণ; কিন্তু এত করিয়াও সেটি যে কাঙালের যত্নের ধন তাহা কেমন করিয়া বুঝাই? মনে হইতেছে যে কাঙালটিকে জলপাত্রটির পাশে বসাইয়া দিলেই তো সব গোল চুকিয়া যায়। কিন্তু এরূপ করিয়া দেখ, দেখিবে চিত্রটি 'কাঙাল' হইয়া গেছে; 'কাঙালের জলপাত্র'— এ চিত্রটি নাই! এই সময়ে কাঙালের জীবনের একটুখানি ইঙ্গিত বা ব্যঙ্গ্য— যেমন তাহার ছিন্ন কন্থার একটুখানি কিম্বা ভিক্ষার ঝুলিটি দিয়া অথবা আরো কোনো সূক্ষ্মতর ইঙ্গিতের সাহায্যে জলপাত্রের শূন্যতা এবং কাঙাল-জীবনের রিক্ততা প্রকাশ করিয়া আমায় চিত্রে কাঙালের জলপাত্রের ব্যঙ্গ্যটি বুঝাইয়া দিতে হয়। এই ব্যঙ্গ্য যে চিত্রকর যত সুচারুভাবে নিজের চিত্রে প্রকাশ করেন ততই তাঁহার অধিক গুণপনা।

একবার এক জাপান-সম্রাট চিত্রকরগণের এই ব্যঙ্গ্যপ্রয়োগশক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সকল চিত্রকরকেই একটি কবিতার এক ছত্র চিত্রিত করিতে দেওয়া হইল, যথা: বিজয়ী বীরকে অশ্ব বহিয়া আনিয়াছে, বসন্তের পুষ্পিত ক্ষেত্রসকলের উপর দিয়া। কত চিত্রকর কত ভাবেই এই কবিতা চিত্রিত করিয়া দেখাইল, কিন্তু সম্রাট কাহাকেও পুরস্কার দিলেন না; পুরস্কার পাইল সেই চিত্রকর যে ধুলায়ধূসর অশ্বটির পদচিহ্নের কাছে একটি প্রজাপতি লিখিয়া ইঙ্গিতে জানাইল— অশ্বক্ষুরলগ্ন নানাপুষ্পরসের শেষ সৌরভটুকু!

ফুলের মধ্যে সৌরভটুকু যেমন চিত্রের মধ্যে ব্যঞ্জনাটুকুও তেমনি।

রূপ আছে, ভাবভঙ্গী আছে, প্রমাণাদি সবই আছে কিন্তু ব্যঞ্জনা নাই, সৌরভ নাই, সে যেন গন্ধহীন পুষ্পমালা। এরূপ ব্যঞ্জনাবিহীন চিত্র যে কিছু নয় তাহা বলা যায় না, কিন্তু এ কথাও বলা চলে না যে তাহা উত্তম চিত্র, কেননা তাহা 'অব্যঙ্গ্য' সুতরাং 'অবর'। শুধু ভাবের ভঙ্গীটুকু দিয়া তুলি রাখিয়া দিলে দর্শকের মন যাইয়া চিত্রে মজে না। চিত্রের ভাবভঙ্গীটি হয়তো আমাদের মনকে তখনকার মতো কাঁদাইয়া কিম্বা আনন্দ দিয়া ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু মনটি গিয়া চিত্রে বসিয়া নব নব ভাবরস পাইয়া মুগ্ধ হয় না। এমন কি, এরূপ চিত্র বারম্বার দেখিতে দেখিতে মনে একটা অরুচিও আসিয়া পড়া সম্ভব। ব্যঙ্গ্য এই অরুচির হাত হইতে চিত্রকে ও ভাবকে রক্ষা করে, তাহাকে পুরাতন হইতে দেয় না, সেটিকে নব নব দিক দিয়া আমাদের নিকটে উপস্থিত করিয়া। ভাবের কার্য হইতেছে রূপকে ভঙ্গী দেওয়া। এবং রূপের আড়ালে মনোভাবের ইঙ্গিতটিকে যেন অবগুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করা হইতেছে ব্যঙ্গ্যের কার্য।

৪ লাবণ্যযোজনা

রূপকে যেমন পরিমিতি দেয় প্রমাণ, যথোপযুক্ত এবং যথাযথ মনোহর একটি সীমার মধ্যে আনিয়া, তেমনি লাবণ্য পরিমিতি দেয় ভাবের কাযকে বা ভঙ্গীকে অদ্ভুত ও উচ্ছৃঙ্খল ভঙ্গী হইতে নিরস্ত করিয়া। ভাবের তাড়নায় ভঙ্গী ছুটিয়া চলিয়াছে উন্মত্ত অশ্বের মতো অসংযত উদ্দাম অসহিষ্ণু, এমন কি অশোভনরূপে আপনাকে প্রমাণের সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া; লাবণ্য আসিয়া তাহাকে শান্ত করিতেছে নিজের মধুর কোমল স্পর্শটি ধীরে ধীরে তাহার সর্বাঙ্গে বুলাইয়া। ভাবের তাড়নায় রূপ যখন শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানকালে দুর্বাসা ঋষির মতো

অপরিমিতরূপে হাত-পা নাড়িয়া, দাঁতমুখ খিঁচাইয়া, উদ্দণ্ড ভঙ্গীতে দাঁড়াইতে চাহিতেছে, তখনই আমাদের লাবণ্য তাহার কাছে আসিয়া বলিতেছে, 'স্থিরো ভব! পাগল হইলে যে!'

প্রমাণের বন্ধনে যে কঠোরতাটুকু আছে, লাবণ্যের বন্ধনে সেটুকু নাই; অথচ সেও বন্ধন, সুনিশ্চিত একটি সুন্দর সুকুমার বন্ধন। সে প্রমাণের মতো জোরে রাশ টানিয়া অশ্বের ঘাড় বাঁকাইয়া দেয় না, কিন্তু তাহার স্পর্শে অশ্ব আপনি ঘাড় বাঁকাইয়া লয় ও তালে তালে পা ফেলিয়া চলে। প্রমাণ যেন মাস্টার, বেত মারিয়া সবলে ছেলেকে সোজা করিতেছে; আর লাবণ্য যেন মা, নানা ছলে ছেলেকে ভুলাইয়া যথেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন।

রুচি যেমন রূপে দীপ্তি দেয়, লাবণ্য তেমনি ভাবে দীপ্তি দিয়া থাকে।

মুক্তাফলেষুচ্ছায়াযাস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে॥

—উজ্জ্বলনীলমণি

মুক্তার রূপের ভঙ্গী নিষ্প্রভ, যদি না তাহাতে লাবণ্যের দীপ্তি থাকে। তেমনি চিত্রের রূপ এবং প্রমাণ এবং ভাব সকলই নিষ্প্রভ, যদি না এই তিনে লাবণ্য আসিয়া দীপ্তি দেয়।

চিত্রের সমস্ত ভাবভঙ্গীতে লাবণ্য একটি শীতলতা শোভনতা দিয়া চিত্রটিকে নয়নস্নিগ্ধকর ও মনোহর করিয়া তোলে। লবণ না থাকিলে যেমন ব্যঞ্জনের স্বাদে ব্যাঘাত ঘটে তেমনি লাবণ্য না থাকিলে চিত্রের রসস্বাদে ব্যাঘাত জন্মায়। সুতরাং লাবণ্যের পরিমাণ, পাকা গৃহিণীর মতো, চিত্রকরকে বুঝিয়া-সুঝিয়া— এক কথায়, প্রমাদ্বারা পরিমিতি দিয়া— প্রয়োগ করিতে হয়। অতিরিক্ত লাবণ্যে চিত্রের ভাবভঙ্গী তিক্ত হইয়া পড়ে, অত্যল্প লাবণ্যে তাহা আস্বাদহীন হয়।

লাবণ্যলেখাটি হইতেছেন সকল সময়ে শুচি এবং সংযতা। তিনি ভাবাদির সহিত যুক্তা হইতেছেন বটে, কিন্তু সর্বদা নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া। লাবণ্য যেন কষ্টিপাথরের কোলে সোনার রেখাটি, কিম্বা পরনের শাড়িখানির কোলে সোনালি পাড়টি!

লাবণ্য পাথরকে নিজের সুনির্দিষ্ট রেখাটি দিয়া অঙ্কিত করিতেছেন, পটখানি ঘেরিয়া আপনার দীপ্তি সুনিশ্চিত সূক্ষ্মরেখায় টানিয়া দিতেছেন; কিন্তু বলিতেছেন যে, পাথর, তুমিও থাকো আমিও থাকি তোমার এই একটুখানি জুড়িয়া— কাপড, তুমিও থাকো আমিও থাকি তোমার একটি ধারে একটুখানি স্থান অধিকার করিয়া। লাবণ্য চিত্রের ভিতরে সর্বাপেক্ষা অধিক কাজ করে অথচ আডম্বরটি তাহার সর্বাপেক্ষা কম। লাবণ্য নিজে শুদ্ধা এবং সংযতা সুতরাং যাহাকেই স্পর্শ করেন তাহাকেই বিশুদ্ধি দেন, সংযম দেন।

৫ সাদৃশ্য

ঘরের কোণে বসিয়া বুড়ি চরকা ঘুরাইতেছে আর ছড়া কাটিতেছে—

চরকা আমার পুত, চরকা আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী॥

বুড়ির চরকাটি যে তাহার নাতি কিম্বা হাতী অথবা পুতের অনুরূপ তাহা নয়; বুড়ির এরূপ দেখিবার কারণ হইতেছে চরকাটির সঙ্গে বুড়ির সংসার ও বুড়ির নিজের মনোভাবের— হাতী কেনা ইত্যাদির— অচ্ছেদ্য সম্বন্ধটুকু। সুতরাং দেখিতেছি, রূপে রূপে মিল অপেক্ষা সাদৃশ্যের পক্ষে ভাবে ভাবে সম্বন্ধ অধিক প্রয়োজনীয়। সদৃশস্য ভাব ইতি সাদৃশ্য। একের ভাব যখন অন্যে উদ্রেক করিতেছে তখনই হইতেছে সাদৃশ্য।

চরকাটি যদি কোনো উপায়ে নাতির রূপটিমাত্র লইয়া বুড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইত— যেমন ইতালীয় চিত্রকরের দ্রাক্ষাগুচ্ছ পাখিকে দেখা দিয়াছিল— তবে বুড়ি হয়তো ঠকিত, কিন্তু যেদিন সে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিত সেদিন চরকার একখানি কাঠিও সে আর আস্ত রাখিত না।

সাদৃশ্যের অর্থ চাতুরীর সাহায্যে রূপের প্রতিরূপটি করিয়া, সোলার সাপ গড়িয়া, লোককে ভয় দেখানো নয়, ঠকানো নয়; কিন্তু কোনো-এক রূপের ভাব অন্য-কোনো রূপের সাহায্যে আমাদের মনে উদ্রেক করিয়া দেওয়া। তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়োধর্মবত্ত্বম্। এক বস্তু অন্য বস্তুর যথার্থ ভাব উদ্রেক করে— দুয়ের আকৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও। যদি একটি জায়গায় দুয়ের মিল থাকে সেই জায়গাটি হইতেছে দুয়ের স্ব স্ব ধর্ম। আকৃতির মধ্যে মিল আছে সেই জন্য বেণীর সহিত সর্পের সাদৃশ্য দেওয়া চলিতেছে বটে, কিন্তু বেণীর স্থানে সাপটিকে কিম্বা সাপের স্থানে বেণীটিকে যেমন রাখিয়াছি অমনি দুয়েরই স্বধর্মে আঘাত করিয়াছি এবং সাদৃশ্য ক্ষুণ্ণ করিয়াছি। সর্পের ধর্ম নয় যে মস্তক হইতে লম্বমান থাকা, মস্তকে দংশন করাই তাহার ধর্ম। কিম্বা বেণীর ধর্ম নয় যে, গাছের তলায় পড়িয়া ভয় দেখানো নির্জীব সর্পের মতো। আবার দেখি চামরের ধর্ম গাত্রে লম্বিত রহা, কেশেরও ধর্ম তাহাই; ইহাদের মধ্যে স্ব স্ব ধর্মের মিলও আছে। কাজেই একে অন্যের স্থান অধিকার করিলেও সাদৃশ্যকে অধিক ক্ষুণ্ণ করে না। চামরও কেশের মতো। আকৃতির সাদৃশ্য এবং দুইয়ের স্ব স্ব ধর্মেরও সাদৃশ্য তেমন সুলভ নহে; সেইজন্য সাদৃশ্য দেখাইবার বেলায় বস্তুর আকৃতি অপেক্ষা প্রকৃতি বা স্বধর্মের দিক দিয়া সাদৃশ্য দেওয়াই ভালো।

কবিতা কবির মনোভাবের সাদৃশ্যকে পায় ও পাঠকের বা শ্রোতার

মনোভাবকে তৎসদৃশ করিয়া তোলে। সুতরাং কবি নির্ভয়ে বলিতে পারেন ‘মুখচন্দ্র’। চন্দ্রে এবং মুখে সেখানে আকৃতির সাদৃশ্য কবি দিতেছেন না, দিতেছেন সেখানে চন্দ্রোদয়ে নিজের মনোভাবের সহিত প্রিয়মুখদর্শনে প্রেমিকের মনোভাবের সাদৃশ্য। কাজেই বলিতে হইতেছে, সেই সাদৃশ্যই উত্তম যাহা কোনো-এক রূপের ব্যঞ্জনাটুকু অন্য-এক রূপ দিয়া ব্যক্ত করে। মনোভাবের সদৃশ হওয়াই সাদৃশ্য।

মুষাসিক্তং যথা তাম্রং তন্নিভং জায়তে যথা।
রূপাদীন্ ব্যাপ্নুবচ্চিত্তং তন্নিভং দৃশ্যতে ধ্রুবম্ ॥

—পঞ্চদশী, দ্বৈতবিবেক

মনোভাব রূপের এবং রূপ মনোভাবের ছাঁদ ছন্দ বা ছাঁচে পড়িয়া উভয়ে উভয়ের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইতেছে। কবি যখন কমলেব সহিত চরণের সাদৃশ্য দিতেছেন তখন তিনি চরণে এবং কমলে আকৃতির সাদৃশ্যটা চূর্ণ করিয়া নিজের মনোভাবটিকেই কমলের মতো লেখার ছন্দটিতে বাঁধিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন, কেননা কেবল রূপের সাদৃশ্য দিয়া লিখিতে গেলে লেখা মনোভাবের সদৃশ কিছুতে হয় না দেখিতেছেন। চিত্রকরও দেখিতেছেন চরণকে কমলাকৃতি দিয়া তিনি, না চরণ, না কমল, দুইয়ের একটিকেও বুঝাইতে পারিতেছেন; এই জন্য তিনি কমলকে চরণের কাছাকাছি পাদপীঠরূপে দেখাইয়া নিজের মনোভাবের সদৃশ করিয়া মূর্তির চরণকমল গড়িতেছেন।

মনে যে সুরটি বাজিতেছে তাহারই অনুরণন যখন বীণায় ঝংকার ও মূর্ছনাদি দিয়া প্রকাশ করিতেছি তখনই বাহিরের বাদনকে অন্তরের বেদনের সদৃশ করিয়া দেখাইতেছি। চিত্রেও তেমনি শতসহস্র রেখা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণভেদাদি যখন মানসমূর্তির সদৃশ করিয়া অঙ্কন করিতেছি তখনই যথার্থ সাদৃশ্য দিতেছি। কাজেই বলিতে হইতেছে যে, ভাবের

অনুরণন যাহা দেয় তাহা উত্তম সাদৃশ্য, আর কেবল আকৃতি বা রূপের অনুকরণ যাহা দেয় তাহা অধম সাদৃশ্য। অনুকৃতি বা অধম সাদৃশ্য কীট-পতঙ্গাদি নানা ইতর শ্রেণীর জীবকে অবলম্বন করিতে দেখা যায়, আকৃতি গোপন করিবার চেষ্টায়। সুতরাং এরূপ সাদৃশ্য চিত্রিতকে ফুটাইয়া তোলে না, বরং অনেক সময়ে তাহাকে লুপ্ত করিয়া দেয়।

৬ বর্ণিকাভঙ্গ

বর্ণিকাভঙ্গ— নানা বর্ণের সংমিশ্রণ ভঙ্গী ও ভাব, বর্ণবর্তিকার টানটোনের ভঙ্গী, ইত্যাদি।

বর্ণজ্ঞান ও বর্ণিকাভঙ্গ ষড়ঙ্গ-সাধনার চরম সাধনা এবং সর্বাপেক্ষা কঠোর সাধনা। মহাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন: বর্ণজ্ঞানং যদা নাস্তি কিং তস্য জপপূজনৈঃ। যদি বর্ণজ্ঞান না জন্মিল, যদি বর্ণিকাভঙ্গটি— ঐ সরু কাঠির টানটোন— দখল না হইল তবে ষড়ঙ্গের পাঁচটি সাধনাই বৃথা। সাদা কাগজ সাদাই থাকিয়া যাইবে যদি তোমার বর্ণজ্ঞান না জন্মায়, তোমার হাতের তুলিটি সাদা কাগজে নানা বর্ণের আঁচড় টানিবে অথবা ঘুণাক্ষরের মতো একটা-কিছু লিখিবে, যদি বর্ণিকাভঙ্গে তোমার দখল না হয়। ষড়ঙ্গের আর-পাঁচটিতে তোমার মোটামুটি দখল জন্মিতে পারে সাদা কাগজে একটিমাত্র আঁচড় না টানিয়া! রূপের ভেদাভেদ তুমি চোখ দিয়া, মন দিয়া বুঝিতে পার, প্রমাণকেও তুমি তুলি ব্যতিরেকেই দখল করিতে পার; ভাব লাবণ্য সাদৃশ্যকেও চোখে দেখিয়া, মনে বুঝিয়া জানিতে পার; কিন্তু বর্ণিকাভঙ্গের বেলায় তুলি তোমাকে ধরিতেই হইবে। এই যে সাদা কাগজখানি— যাহাকে ইচ্ছা করিলেই শতখণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারি— তুলির ডগায় একটুখানি কালি লইয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে এত ভয় পাই কেন? চিত্রিত করিবার

মানসে সাদা কাগজখানিকে যখনই নিজের সম্মুখে বিস্তৃত করিয়াছি তখনই আর সেখানি সাদা কাগজ নাই। তখন সে আমার আত্মার দর্পণ। বীজের মধ্যে যেমন সম্পূর্ণ গাছটি নিহিত থাকে, তেমনি ঐ সাদা কাগজখানিতে সমস্ত রূপ, সমস্ত প্রমাণ, সমস্ত ভাব লাবণ্য ও বর্ণভঙ্গী লইয়া আমার আত্মাটি প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে দেখি। সেইজন্য সহসা তাহাকে তুলি দিয়া স্পর্শ করিতে ভয় হয়, হাত কাঁপিতে থাকে। পটখানির উপর এই শ্রদ্ধা, এই সমীহটুকু চিত্রকরের চিরকাল অনুভব করা চাই। কিন্তু তুলি ধরিলেই ঐ যে হাতটি কাঁপিতেছে, ঐ ভয়টুকুও মন হইতে দূর করা চাই। হাত একটু কাঁপিবে না; তুলি আমার অনিচ্ছায় একতিল অগ্রসর হইবে না বা পিছাইবে না, বামে দক্ষিণে একটুমাত্র হেলিবে না। বর্ণিকাভঙ্গের এই সর্বাপেক্ষা কঠিন সাধনা। কাগজের কাছে তুলিটি লইবামাত্র চুম্বকের মতো কাগজ যেন তুলিকে টানিয়া লইতেছে, কিছুতেই রুখিতে পারিতেছি না; হাত যেন প্রবল জ্বরে কাঁপিতেছে, বাগ মানিতেছে না। এই হাতকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তুলিকেও বশে আনাই প্রধান কাজ। এটি হইয়া গেলে আর বাকি কাজ সহজ।

সিতো নীলশ্চ পীতশ্চ চতুর্থো রক্ত এব চ।
এতে স্বভাবজা বর্ণা···
সংযোগজা পুনস্ত্বন্যে উপবর্ণা ভবন্তি হি॥

শ্বেত রক্ত নীল পীত এই চার স্বভাবজ বর্ণ, এই চারের সংযোগে নানা উপবর্ণের সৃষ্টি হয়। এইটুকু শিখিতে, কিম্বা যেমন—

সিতপীতসমাযোগঃ পাণ্ডুবর্ণ ইতি স্মৃতঃ।
সিতরক্তসমাযোগঃ পদ্মবর্ণ ইতি স্মৃতঃ॥
সিতনীলসমাযোগঃ কাপোতো নাম জায়তে।
পীতনীলসমাযোগাৎ হরিতো নাম জায়তে॥

নীলরক্তসমাযোগাৎ কাষায়ো নাম জায়তে।
রক্তপীতসমাযোগাৎ গৌরইত্যভিধীয়তে ॥
এতে সংযোগজাবর্ণাহ্য পবর্ণাস্তথা পরে।
ত্রিচতুর্বর্ণসংযুক্তা বহবঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥...
দুর্বলস্য চ ভাগৌ দ্বৌ নীলবর্ণাদৃতে ভবেৎ ॥
নীলস্যৈকো ভবেদ্ভাগশ্চত্বারো অন্যস্য তু স্মৃতাঃ।
বর্ণস্যতু বলীয়স্ত্বং নীলস্যৈবং হি কীর্ত্যতে ॥

—নাট্যশাস্ত্র, ২১ অধ্যায়, শ্লোক ৬০-৬৫

সাদায় পীলায় পাণ্ডুবর্ণ, লালে সাদায় পদ্মবর্ণ, নীলায় সাদায় কপোতবর্ণ, পীলায় নীলে হরিৎ, লালে নীলে কাবি (কাষায়), পীলায় লালে গৌর— এইটুকু শিখিতে, কিম্বা তিন-চার বর্ণের সংযোগে বহুতর উপবর্ণের সৃষ্টি হয়, সবল বর্ণ অপেক্ষাকৃত দুর্বল বর্ণ অপেক্ষা দ্বিগুণ বল ধরে, কেবল নীলবর্ণ অন্য বর্ণের চারিগুণ বলবান ও সকল বর্ণ অপেক্ষা বলীয়ান, এই সহজ কথাগুলো মুখস্থ করিয়া এবং কার্যত প্রয়োগ করিয়া শিখিয়া লইতে অধিক সময় যায় না। কিন্তু নিজের হাতকে নিজের বশে আনাই বিষম ব্যাপার।

যাহারা তলোয়ার খেলিতে শেখে তাহারাই জানে একটা লোহার শিক বা একটা হাতীর মুণ্ড কাটা সহজ, কিন্তু বাতাসে একখানি রুমাল উড়াইয়া দিয়া সেটিকে দুই টুকরা করায় হস্তের ও অসিঘাতের কি আশ্চর্য লঘুতা ও ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন!

চোখের তারাটি যাহা তিলমাত্র বিচলিত হইলে, নিটোল গালের রেখাটি যাহা একচুল এদিক ওদিক হইলে, লতাতন্তু অপেক্ষা সূক্ষ্ম হাসিরেখা যাহা একটু কাঁপিলে, সব নষ্ট হইয়া যায়— তুলির আগায় সেগুলি আঁকিয়া দেখানো হস্তের কি ক্ষিপ্রকারিতার, স্পর্শের কত

লঘুতারই অপেক্ষা রাখে। বর্ণিকাভঙ্গের যে বর্ণপরিচয় তাহার প্রথম পাঠ দ্বিতীয় পাঠ নাই, তাহার একটিমাত্র পাঠ, সেটি হইতেছে লঘুপাঠ বা হস্তলাঘবতা।

হাত তুলিকে গড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে, হাত তুলিকে ক্ষুরধারে কাগজ কাটিয়াই যেন চালাইয়া দিতেছে, হাত ছোঁয়-কি-না-ছোঁয় ভাবে তুলিকে কাগজের উপর দিয়া উড়াইয়া লইতেছে, ইহাই হইতেছে আমাদের লঘুপাঠের পাঠ্য ও বর্ণিকাভঙ্গের সারাংশ।

দপ্তরি রেখাটি টানিতেছে ঠিক সোজা ভাবে একেবারে চুলপ্রমাণ। কিন্তু তাহা বলিয়া বলিতে পারি না যে, বর্ণিকাভঙ্গে দপ্তরি পরিপক্ক হইয়াছে কিম্বা সে যে রেখাটি টানিয়াছে সেটি চিত্রকরের রেখার মতো জীবন্ত রেখা। কেননা, দপ্তরি রেখাটি টানিতেছে প্রাণ দিয়া নয়, হাতটি দিয়া। কলের রুলও যে কাজ করিতেছে দপ্তরির হাতও সেই কাজ করিতেছে। দপ্তরিকে কোনো চিত্রকরের টানা রেখাটি লিখিতে দাও, দেখিবে তাহার হাত একেবারে অশক্ত। চিত্রকরের রেখায় আর দপ্তরির রেখায় প্রভেদ এই যে, একটি জীবন্ত, আর-একটি নির্জীব। চিত্রকরের প্রাণের ছন্দ একই রেখাকে কখনো গড়াইয়া, কোথাও কাটিয়া বসাইয়া, কোথাও বা ছুঁইয়া-কি-না-ছুঁইয়া যেন উড়াইয়া লইতেছে। কপাল হইতে আরম্ভ করিয়া চিবুক পর্যন্ত মুখের একপাশের রেখাটি টানিতে চেষ্টা করো, দেখিবে তুলির তিন প্রকার ভঙ্গ, ভঙ্গী বা স্পর্শ তোমায় প্রয়োগ করিতে হইবে। কপালের অস্থি সুদৃঢ়, সেখানে তোমায় তুলিতে দৃঢ়তা দিয়া— গাল সুকোমল, সেখানে তুলিকে গড়াইয়া দিয়া, কোমলতা দিয়া— নাতিদৃঢ় চিবুকের কাছে কোমলে কঠোরে মিলাইয়া রেখাটি টানিতে হইবে। একই রেখাকে কঠোর কোমল এবং নাতি-কোমল, একটি টানকেই স্থির ও বিগলিত এবং স্থিরবিগলিত করিয়া

দেখানো, আর বর্ণ সম্বন্ধে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা এবং বর্ণবর্তিকাপ্রয়োগ সম্বন্ধে হস্তলাঘবতাই বর্ণিকাভঙ্গের সমস্ত শিক্ষাটুকু।

তুলিটি ঠিক কতটুকু ভিজাইব, তাহার আগায় ঠিক কতটা রঙ তুলিয়া লইব ও ঝাড়িয়া ফেলিব এবং সেই রঙ-সমেত ভিজা তুলিটি ঠিক কতটুকু চাপিয়া অথবা কতখানি না চাপিয়া কাগজের উপর বুলাইয়া দিব—ইহাঁরিই সম্বন্ধে প্রমা লাভ করা হইতেছে ষড়ঙ্গের বর্ণিকাভঙ্গ নামে শেষ শিক্ষা বা চরম শিক্ষা। চিত্রে মনের রঙকে ফলাইয়া তোলা, মনের অন্ধকারকে ঘনাইয়া আনা, মনের আলো'কে জ্বালাইয়া দেওয়া এবং মনের ষড্‌ঋতুর বিচিত্রচ্ছটাকে প্রকাশিত করাই হইতেছে বর্ণিকাভঙ্গে বর্ণজ্ঞান।

বর্ণজ্ঞান শুধু অক্ষরের অথবা রেখার বা বর্ণের রূপ জানা নয়, শুধু এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের সংমিশ্রণে নানা উপবর্ণাদি সৃষ্টি করাও নহে, কিন্তু বর্ণের তত্ত্ব এবং রূপ দুইয়েরই জ্ঞান।

তন্ত্রশাস্ত্রে অক্ষর এবং রেখাসকলের এক-একটি আত্মা এবং এক-একটি বিশেষ বর্ণ দেওয়া হইয়াছে, যেমন—

আকারং পরমাশ্চর্যং শঙ্খজ্যোতির্ময়ং···
ব্রহ্মাবিষ্ণুময়ং বর্ণং তথা রুদ্রঃ স্বয়ং।

ব্রহ্মাবিষ্ণু-আত্মক এবং শঙ্খজ্যোতির্ময় পরমাশ্চর্য যে 'আ' অক্ষর তিনি স্বয়ং রুদ্র। গায়ত্রীতন্ত্রেও গায়ত্রীর এক-একটি অক্ষরকে এইরূপ আত্মাবান বলা হইয়াছে, যেমন—

গায়ত্র্যা প্রথমং বর্ণং পীতচম্পকসন্নিভং।
অগ্নিনা পূজিতং বর্ণং আগ্নেয়ং পরিকীর্তিতম্‌॥

গায়ত্রীর প্রথম বর্ণ চম্পকের ন্যায় পীত, তিনি অগ্নির দ্বারায় অর্চিত সুতরাং আগ্নেয়।

কালি দিয়া রেখাটি টানিতেছি কিন্তু মনে চিন্তা করিতেছি এই তুলির অক্ষর কেহ শ্যাম, কেহ কপিল, কেহ ইন্দ্রনীলাভ। সুধু ইহাই নয়— কোনো অক্ষর অগ্নির ন্যায় দুর্ধর্ষ, কেহ নীল আকাশের ন্যায় স্নিগ্ধ, ইত্যাদি।

নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

বর্ণানাং তু বিধিং জ্ঞাত্বা তথা প্রকৃতিমেবচ কুর্যাদঙ্গস্য রচনাম্।

বর্ণের বিধি এবং প্রকৃতি— অর্থাৎ কোন্ বর্ণ আকৃতিকে গোপন করে, কে তাহা ফুটাইয়া তোলে ইহার বিধি; কোন্ বর্ণ আনন্দিত করে, কে বিষাদিত করে, কে বা বৈরাগ্য বুঝায়, কে বা অনুরাগ জানায় ইত্যাদি বর্ণের প্রকৃতি— বুঝিয়া তবে অঙ্গ রচনা করিও।

কথায় বলে: কালি কলম মন, লেখে তিন জন। মন কোথায় গোপনে বসিয়া কালোর উপরে আলো, আলোর উপরে কালো টানিতেছে আর অমনি হাত সমেত তুলি সেই আলোর কম্পনে দুলিয়া উঠিতেছে, কালোর বর্ণে রাঙিয়া উঠিতেছে! চোখেব বর্ণজ্ঞান হইতেছে না, হইতেছে মনের। হাতের বর্ণিকাভঙ্গ দখল হইতেছে না, হইতেছে মনের। বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে চোখকে বিশ্বাস করিতে পারি না, কেননা অনেক চোখ নীলকে দেখে হরিৎ, লালকে দেখে পীত। এবং একটি সামান্য পাতার উপরে ষড়্ঋতুতে নিমেষে নিমেষে আমাদের সুখদুঃখের আলোক-কম্পনের ভিতর দিয়া যে ভাবের রঙটি ফুটিয়া উঠিতেছে, মিলাইয়া যাইতেছে নূতন হইতে নূতনে, তাহাকে ধরাও চোখের সাধ্য নয়। চোখ বসন্তকালের সমস্ত পাতার মোটামুটি একটা বাসন্তী রঙ দেখিতে পাইতেছে— নীলপীত সমাযোগাৎ। কিন্তু বাস্তবিক বসন্তের রঙটিতে রাঙিয়া উঠিতেছে আমাদের মন। তা ছাড়া ষড়্ঋতু তো শুধু বর্ণটুকু লইয়াই আমাদের কাছে আসিতেছে না, বর্ণ গন্ধ গান স্পর্শ ইত্যাদি সমস্ত দিয়া সে

আপনাকে আমাদের মনের নিকটে প্রকাশ করিতেছে। ইহারই বর্ণন হইতেছে বর্ণের কাজ। বর্ণ শুধু রঞ্জিত করে না, বর্ণ চিত্রকে বর্ণিত করে। শুধু ফুলের রঙটুকু নয়, তাহার সৌরভটিও, শুধু সূর্যকিরণের রঙটুকু নয়, তাহার উত্তাপের স্পর্শটি পর্যন্ত সকালে কিরূপ, সন্ধ্যায় কিরূপ, দ্বিপ্রহরে কতটা— বর্ণ দিয়া এ-সমস্তই বর্ণন করিতে শেখা চাই।

দময়ন্তীস্বয়ম্বরসভার চিত্র লিখিতেছি— পঞ্চ নলকে, দময়ন্তীকে, সকল সখী ও সকল রাজাদের লিখিয়া সমস্তটির উপরে পুষ্পচন্দন ধূপদীপের গন্ধটি বর্ণ দিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। চিত্রে বর্ষা বর্ণন করিতেছি— ময়ূর দিলাম, গাছ দিলাম, মেঘের আকার দিলাম, অভিসারিকা রাধাকেও দিলাম, কেবল বর্ণ দিতে পারিলাম না, সব ব্যর্থ হইয়া গেল। মেঘের ধ্বনি শুনিতে পাইলাম না, গাছের তলায় সুরভিত অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল না, ভিজা মাটির গন্ধে চিত্রটি ভরিয়া উঠিল না— মনের অভিসার ব্যর্থ হইয়া গেল।

বর্ণ মেশায় না চোখ, বর্ণ মেশায় মন। মন শরতের আকাশকে কতটা নীল দেখিতেছে বা কতকটা উজ্জ্বল অথবা ম্লান দেখিতেছে তাহারই ওজনটুকু নীলে মেশানোই বর্ণকে ভঙ্গী দেওয়া। আমি কালি দিয়াও শরতের আকাশ দেখাইতে পারি যদি মনের রঙটুকু সেই কালিতে আনিয়া মেশাই। কালি তখন আর কালি থাকে না যদি মন তাহাকে রাঙায় আপনার বর্ণে।

> কালী কি কালো? দূরে তাই কালো।
> চিনতে পারলে আর কালো নয়। —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

মন যতক্ষণ কালি হইতে পৃথক আছে, কালি ততক্ষণ কালো কালি মাত্র। আর মন আসিয়া যেমনি মিলিয়াছে অমনি কালি আর কালো নাই, সে ষড়ঙ্গের বরণডালায় আলোর শিখার মতো জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

ষড়ঙ্গদর্শন

রস, ছন্দ, রূপ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ— চিত্রের আপাদমস্তক এই অষ্টাঙ্গকে আমরা এতক্ষণ আমাদের দিক দিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম; এখন এই চিত্র সম্বন্ধে আমাদের চিন্তার প্রতিধ্বনি আর-কোনো প্রাচ্য শিল্পে পাই কি না দেখা কর্তব্য। প্রাচ্য শিল্পের মধ্যে জাপান-শিল্প এখন জগতের নিকট সুবিদিত এবং তাহার সমস্ত চিন্তাটুকু প্রাচীনতর চীন-শিল্পের দ্বারাই অনুপ্রাণিত; সুতরাং তাহাকেই অবলম্বন করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

প্রথমেই দেখা যাক রস বলিতে আমরা কি বুঝি এবং জাপানই বা কি বোঝেন। আমাদের আলংকারিকগণ রসকে বলিতেছেন: ব্রহ্মস্বাদমিব অনুভাবয়ন্। যেন বৃহতের আস্বাদ দিয়া তাবৎকে বড় করিয়া তুলিয়া রহিয়াছে যে মহৎ আস্বাদ তাহাই রস।

জাপান এই রসকে বলিতেছেন—*Ki In* . . . that indefinable something which in every great work suggests elevation of sentiment, nobility of soul.

—Bowie, *On the Laws of Japanese Painting*, p. 83.

কাব্যপ্রকাশ-প্রণেতা মম্মট রসকে বলিয়াছেন: স চ ন কার্য নাপি জ্ঞাপ্য। তাঁহার মতে রস আপনাকে অনুভব করায়: পুরইব পরিস্ফুরন্, হৃদয়মিব প্রবিশন্, সর্বাঙ্গীনমিব আলিঙ্গন্ অন্যৎ সর্বমিব তিরোদধৎ। জাপানেরও ***Ki In*** অথবা রস সম্বন্ধে Bowie সাহেব বলিতেছেন—

From the earliest times the great art-writers of China and Japan have declared that this quality . . . . can neither be imparted nor acquired [স চ ন কার্য নাপি জ্ঞাপ্য] It is . . . . akin to what the Romans meant by 'divinus afflatus', that divine and vital breath which vivifies . . . . the work and renders it immortal [হৃদয়মিব প্রবিশন্].

—*On the Laws of Japanese Painting*, p. 43.

ছন্দকে আমাদের অভিধানে বলা হইয়াছে আহ্লাদয়তি ইতি—ইনি হ্লাদিত করেন, ইনি হ্লাদিনীশক্তি !

সত্তত্বমাশ্রিতা শক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিয়াঃ।
বর্ণা ভিত্তিগতা ভিত্তৌ চিত্রং নানাবিধং যথা ॥

—পঞ্চদশী, ভূতবিবেক, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, শ্লোক ৫৯

স্বভাবত বর্ণহীন-ভিত্তিতে সংগত হইয়া, বর্ণসকল ভিত্তিটিকে যেমন নানা রূপে চিত্রিত করিতেছে তেমনি স্বভাবত নিষ্ক্রিয় যে সৎ তাঁহাতে সংগত হইয়া শক্তি তাঁহাকে বিক্রিয়া দিতেছেন। কাজেই দেখিতেছি, হ্লাদিনী যে শক্তি তিনি— এক দিকে গতি বা মুক্তি, আর-এক দিকে স্থিতি বা বন্ধন— দুই পারের এই দুই আলিঙ্গনে সৎ যে তাঁহাকে দোলা দিয়া বিক্রিয়া দিতেছেন। হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। সৎ যে বস্তুটি স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয় তিনি হ্লাদিনীশক্তির সচেতন আলিঙ্গন পাইয়া চিৎ এবং আনন্দরূপে নন্দিত হইয়া উঠিতেছেন বা ছন্দিত হইতেছেন।

জাপানের শিল্পাচার্য ওকাকুরা চীন-ষড়ঙ্গের প্রথম অঙ্গটির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা এই ছন্দ বা হ্লাদিনীশক্তিকেই বুঝাইতেছে, যথা—

Ch'i-yun Sheng Tung. The Life-movement of the Spirit through the Rhythm of Things . . . . The great

mood of the universe [সৎ] moving hither and thither amidst the harmonic laws of matter [হ্লাদিন্যা সম্বিৎ] which are Rhythm.

—Okakura, *Ideals of the East,* p. 52.

Spirit বা প্রাণে সংগত হইয়া যে শক্তি বিক্রিয়া (movement) রচনা করে তাহাই হইতেছে ছন্দ বা হ্লাদিনীশক্তি। এক কথায় বলিতে গেলে ছন্দ বা হ্লাদিনীশক্তি প্রাণের স্পন্দন— Life movement of the Spirit। এই ছন্দকে জাপানীরা কহেন *Sei do* [ছন্দ, ছাঁদ]—

This is one of the marvellous secrets of Japanese painting handed down from the great Chinese painters and based on psychological principles— matter responsive to mind.

এই ছন্দ বা হ্লাদিনীশক্তির প্রয়োগ চিত্রে কি ভাবে করিতে হইবে—

Should he depict the sea-coast with its cliffs and moving waters, at the moment of putting the wave-bound rocks into the picture he must feel that they are placed there to resist the fiercest movement of the Ocean, while to the waves in turn he must give an irresistible power to carry all before them ; thus by this sentiment called living movement (*Sei do*) reality is imparted to the inanimate object.

—*On the Laws of Japanese Painting,* p. 78.

চিত্রকরের নিকট *Sei do* বা ছন্দশক্তির কার্য এই ভাবে ধরা

দিতেছে, যথা, অন্তরের দ্বারা বাহির বা মনোগত যাহা তাহার দ্বারা বস্তুরূপটি অনুরণিত হইতেছে। পর্বতটি যখন লিখিতেছি তখন পর্বতের দৃঢ়তা স্থিরতা মনে আনিয়া, এক কথায় ছন্দের স্থিতির দিকটিকেই মনে ধরিয়া, লিখিতেছি। আবার যখন তরঙ্গভঙ্গ লিখিতেছি তখন লিখিতেছি, স্থিতির বিপরীত, ছন্দের যে গতির দিক তাহাকেই মনে ধরিয়া।

ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তম্বপর্যন্তাঃ প্রাণিনোঽত্র জড়া অপি।
উত্তমাধমভাবেন বর্তন্তে পটচিত্রবৎ॥

—পঞ্চদশী, চিত্রদীপ, শ্লোক ৫

আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত কি জীব কি জড় উত্তমাধমভাবে যে যাহার যথাস্থান অধিকার করিয়া আছে, চিত্রপটে নানাবিধ সামগ্রী যে ভাবে সজ্জিত থাকে।

চীন-ষড়ঙ্গের পঞ্চম অঙ্গটির যে অনুবাদ ফরাসী পণ্ডিত পেৎরুচি (Petrucci) এবং বিলাতের বিনিয়ন্ (Binyon) সাহেব দিয়াছেন তাহা পঞ্চদশীর চিত্রদীপের এই পঞ্চম শ্লোকটির অবিকল প্রতিধ্বনি, যথা—

Disposer les lignes et leur attribuer leur place hiérarchique.

—Petrucci, *La Philosophie de la Nature dans l'art de l'Extreme Orient*, p. 89.

Composition and subordination, or grouping according to the hierarchy of things.

—L. Binyon, *The Flight of the Dragon*, p. 13.

আমাদের ঋষিগণ বলিয়াছেন যে রূপের ধর্মই হইতেছে প্রতিবিম্বিত

হওয়া, কল্পিত হওয়া, ছন্দিত হওয়া এবং ছায়াতপে প্রকাশিত হওয়া, যেমন—

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে যথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥

—কঠোপনিষদ্, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বল্লী, শ্লোক ৫

আত্মাতে দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায়, পিতৃলোকে স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায়, গন্ধর্বলোকে যেন জলের কম্পনের উপরে এবং আমাদের এই ব্রহ্মলোকে ছায়া এবং আতপ এতদুভয়ের বৈষম্য দিয়া।

'যথাদর্শে তথাত্মনি' এই ভাবটির ঠিক অনুরূপ ভাবটি ব্যক্ত করিতেছে জাপানের *Sha I*, যথা—

They paint what they feel rather than what they see, but they first see very distinctly [আত্মাতে প্রতিবিম্বিতবৎ]. It is the artistic impression (*Sha I*) which they strive to perpetuate in their work.

—*On the Laws of Japanese Painting*, p. 8.

আত্মাতে প্রতিবিম্বিত না দেখা পর্যন্ত রূপকে সম্পূর্ণ বোধ করা অথবা প্রকাশ করা অসম্ভব ; ইহা জাপানও বলিতেছেন, আমাদের ঋষিগণও বলিয়া গিয়াছেন।

ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে। রূপ প্রকাশ পাইতেছে ছায়াতপের বৈষম্য দিয়া, যেমন—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

—মুণ্ডক উপনিষদ

দুই সুন্দর পক্ষী, শ্বেত কৃষ্ণ, জাগ্রত ঘুমন্ত, যেন ছায়াতপের মতো

একত্র বাস করিতেছে। একটি পক্ষী ফল আস্বাদ করিতেছে, গান গাহিতেছে, অন্যটি চুপচাপ বসিয়া তাহা দেখিতেছে। জীবাত্মা পরমাত্মা, (Spirit and Matter), আকার নিরাকার, রূপ ও অরূপ— এই দুইয়ের সমতা ও বৈষম্য ব্যক্ত করিতেছে ভারতের উল্লিখিত যে সনাতন চিন্তাগুলি তাহার ঠিক প্রতিধ্বনি দিতেছে জাপান-চিত্রশিল্পের *In Yo* মন্ত্রটি, যথা—

In Yo . . . requires that there should be in every painting the sentiment of active and passive, light and shade [ছায়াতপ] . . . The term *In-Yo* originated in the earliest doctrines of Chinese philosophy and has always existed in the art-language of the orient. (?) It signifies darkness [*In* = ছায়া] and light [*Yo* = আতপ], negative and positive, female and male [প্রকৃতি পুরুষ], passive and active [যেমন স্বা সুপর্ণা], lower and upper [উত্তমাধম] even and odd . . . . Two flying crows, one with its beak closed, the other with its beak open . . . . or two dragons, one ascending to the sky, the other descending to the ocean—illustrate the phases of *In-Yo*.

—*On the Laws of Japanese Painting*, p. 48.

আমাদের ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় অঙ্গ 'প্রমাণানি' (correct perception, proportion, measure and structure of forms) ও চীন-ষড়ঙ্গের দ্বিতীয় অঙ্গ (anatomical structure) যে সাধারণ ভাবে মিলিতেছে তাহা নয়। চীন ও জাপানের চিত্রশিল্পে এই প্রমাপ্রয়োগের পুঙ্খানুপুঙ্খ উপদেশগুলিও যেন প্রমা সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাগুলির প্রতিধ্বনি দিতেছে।

প্রমা অর্থে আমরা বুঝিতেছি কোনো বস্তুর ভ্রমভিন্ন জ্ঞান—তাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ইত্যাদির পরিমাণ। জাপান-শিল্পের *Ichi Isho* এই চিন্তারই প্রতিধ্বনি করিতেছে, যথা—

Ichi and Isho . . . they aim to supply and express with sobriety what is essential to the composition, proportion (*Ichi*) determining the just arrangement and distribution of the component parts, and design (*Isho*) the manner in which the same shall be handled.

—*On the Laws of Japanese Painting*, p. 46.

প্রমাণ বা প্রমা যে কেবল বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ বুঝায় তাহা নয়, প্রমাদ্বারা আমরা বস্তুর দূরত্ব এবং নৈকট্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হই। চীনা শিল্প-শাস্ত্রে এই দূরত্ব ও নৈকট্য বুঝাইবার নীতিটিকে বলা হইয়াছে—

En kin . . . so far as the perspective is concerned, in the great treatise of Chu Kaishu entitled *The Poppy Garden Art Conversation*, a work laying down the fundamental laws of landscape painting, artists are specially warned against disregarding the principle of perspective called *En-Kin*, meaning what is far and what is near.

—*On the Laws of Japanese Painting*, p. 8.

আমাদের অলংকারশাস্ত্রে বলা হইতেছে, যথা—

শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গ্যন্ত্ববরম্ স্মৃতম্।

—কাব্যপ্রকাশ, প্রথম উল্লাস

চিত্রমাত্রই অবর— কি শব্দচিত্র কি বাচ্যচিত্র— যদি তাহাতে ব্যঙ্গ্য না থাকে, ইঙ্গিত না থাকে। জাপানী শিল্পশাস্ত্রে ব্যঙ্গ্যকে বলা হইয়াছে—

Yu kashi . . . such suggestion or stimulation of the imagination is called *Yu kashi.* The Japanese painter is early taught the value of suppression in design.

—*On the Laws of Japanese Painting*, p. 47.

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে আমাদের বেদান্ত উপনিষদ্ প্রভৃতির গভীরতম সূক্ষ্মতম চিন্তাগুলির প্রতিধ্বনি দিতেছে চীনের ও জাপানের চিত্র সম্বন্ধে ষড়্দর্শন।